ভে তরে
ব্রিকস শীর্ষ বৈঠক ২
কৃষক জনগণের দুর্দিনের মোকাবিলায় ৩
২৮ জুলাই শহীদ দিবস স্মরণ ... ৪
বামপন্থার সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা ... ৫
এ ভাঙ্গন কেমন ভাঙ্গন ... ৬
দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের বিজয় ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৩১ জুলাই ২০১৪

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে গুটিয়ে আনার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন

সংবাদপত্রের মাধ্যমে সম্প্রতি জানা গেল, মোদী সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে এক নতুন পরিকল্পনার কথা রাজ্য সরকারগুলোকে জানিয়েছে এবং নতুন পরিকল্পনা অনুসারে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য মানুষদের নতুন তালিকা তৈরির জন্য রাজ্যগুলোকে নামতে বলা হয়েছে। আগস্ট মাস থেকেই এই তালিকা তৈরির কাজ শুরু হবে। খবরে আরও প্রকাশ যে সরকারের নতুন পরিকল্পনায় পিছিয়ে থাকা ব্লক ও পিছিয়ে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলোই ১০০ দিনের কাজে অগ্রাধিকার পাবে। সমগ্র দেশে মোট ৬,৫৭৬টি ব্লকের মধ্যে এরকম ব্লকের সংখ্যা হবে ২,৫০০। আবার পিছিয়ে থাকা ব্লকের মধ্যেও কাজ করতে ইচ্ছুক এমন সকলকেই কাজ দেওয়া হবে না এবং 'সরকারের চোখে' সত্য সত্যই যাদের কাজের প্রয়োজন তারাই আসবে এই প্রকল্পের আওতায়। পিছিয়ে থাকা ব্লকগুলো চিহ্নিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলোকেই দেওয়া হয়েছে এবং প্রাপকদের তালিকাও তৈরি করবে রাজ্য সরকার। অবশ্য ব্লকগুলো চিহ্নিত হবে যোজনা কমিশনের ঠিক করে দেওয়া পদ্ধতি মেনে এবং প্রাপকদের তালিকাও তৈরি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেওয়া মাপকাঠি মেনে। এর কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল যে রাজস্থানের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছেন, জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনটি খারিজ করে দিয়ে এটিকে এক স্রেফ প্রকল্প হিসাবে দেখা হোক, যাতে প্রকল্প রূপায়ণে সরকারের কোন আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকে। এটা নিছকই এক মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব নয়, সরকারের উচ্চস্তরেই এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবনা আছে। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও 'পপ্যুলিজম' বন্ধ করা এবং দেশের অর্থনীতির স্বার্থে কিছু 'কঠোর' সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছেন। এবারের বাজেটে অবশ্য ১০০ দিনের প্রকল্পে বড় ধরণের কোন কাটছাঁট না থাকলেও বরাদ্দের পরিমাণ গত বছরের ৩৪ হাজার কোটি টাকাতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির জমানায় এর অর্থ হল গত বছরের বরাদ্দের তুলনায় এবছরের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া। কর্পোরেট জগতের পরামর্শ হল 'নিছকই' কর্মসংস্থান তৈরির পেছনে অর্থ ব্যয় না করে পরিকাঠামো তৈরিতে এই অর্থ ব্যয় হোক। মানুষকে অনন্তকাল 'ভর্তুকি' দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা নয় বরং উপযুক্ত পরিকাঠামোর সাহায্যে তার উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তাকে 'স্বনির্ভর ও প্রতিযোগিতার জন্য' উপযোগী করে তোলা হোক। বুর্জোয়া ও কর্পোরেট জগত সবসময় অবাধ প্রতিযোগিতার কথা বলে, বাজারের শক্তিকে অবাধ করার কথা বলে। এখানে কোন ধরণের ভর্তুকি প্রদানের স্থান নেই। অথচ কর্পোরেট জগতের জন্য দান-খয়রাতি ও কর ছাড় অবাধ থাকবে। গত বছরেই কর্পোরেট ক্ষেত্রকেই ৭৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এবছরে তা আরও বাড়বে। আর অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থই তো শক্তিমানের সঙ্গে দুর্বলের অসম প্রতিযোগিতা। কিন্তু দুর্বলকে সবল করে তোলার জন্য কোন ধরণের সরকারি সহযোগিতা থাকবে না।

এমনিতেই কর্মসংস্থান প্রকল্পে কর্মসংস্থান হয় খুবই কম, এ প্রশ্নে সরকার আদপেই আন্তরিক নয়। বড় সংখ্যক গরিব মানুষের হাতে এখন জবকার্ডই নেই। তিন বছর আগে এক সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, এই প্রকল্পে গ্রামীণ পরিবারগুলোর মাত্র ২৪ শতাংশ কাজ পায় এবং এই পরিবারগুলো কাজ পায় গড়ে বছরে ৩৭ দিন মাত্র। ২০১১-১২ সালের হিসাবেও দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে প্রাপক পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৫ কোটি, পরিবার পিছু কাজ পেয়েছে মাত্র ৪২ দিন। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৩-১৪ সালে প্রাপক পরিবারগুলো মাত্র ৩৮ দিন কাজ পেয়েছে। মজুরির প্রশ্নে গ্রামীণ গরিবেরা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি কখনই পায় না। পশ্চিমবঙ্গেই বকেয়া মজুরির পাহাড় জমেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রাপকদের কাজ দিতে না পারলে সরকারকে ভাতা দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ভাতা প্রাপ্তির ঘটনা খুবই কম, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় নেই বললেই হয়। আবার এই প্রকল্পে গ্রামীণ গরিবেরা যে মজুরি পান তাও কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি থেকে অনেক কম। এ সমস্ত কিছুই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর বেদরদী ও দায়সারা মনোভাবকেই দেখিয়ে দেয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

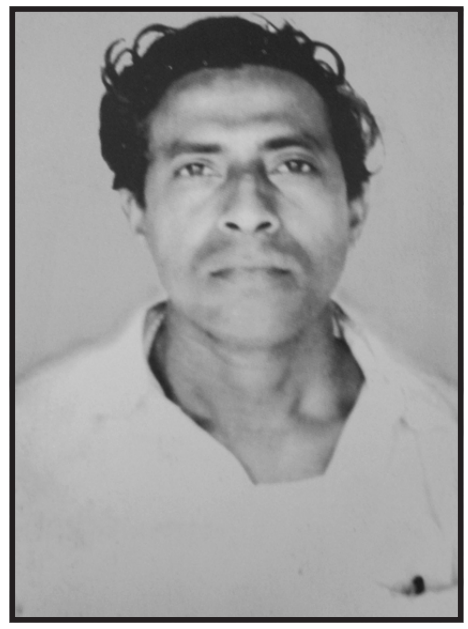

৫ আগস্ট আপোষহীন কমিউনিস্ট বিপ্লবী তথা সি পি আই (এম এল) নেতা কমরেড সরোজ দত্তের ৪৪তম শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশেষ ঘোষণা

আগামী ৭ আগস্ট সংখ্যা থেকে "আজকের দেশব্রতী"-র দাম হবে ৩.০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হবে ১৫০.০০ টাকা, ষান্মাসিক মূল্য ৮০.০০ টাকা। ২০০০ সালের জুলাই মাস থেকে ৮ পাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের এযাবত সময়কালে প্রকাশনা খরচ ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে মূল্য কিছুটা বাড়াতে হল। আশা করি পাঠকদের সহযোগিতা যেমন থেকেছে তা থাকবে।

আমাদের প্রিয় কমরেড তৃপ্তিদাকে মনে রেখে

কমরেড তৃপ্তি ত্রিবেদী। চলে গেলেন ৬৮ বছর বয়সে। রেখে গেলেন স্ত্রী, তিন পুত্র, পুত্রবধূ সহ পরিবার-পরিজন, অগণিত কমরেড ও বন্ধুজনদের।

২৫ জুলাই ২০১৪। আগের দিন সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরেছি। ভোর ৬-১৫ মিনিটে একটা ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গল। ফোনটা ধরে দেখি দিল্লী থেকে কমরেড রামকিষাণের ফোন (কমরেড রামকিষাণজী কেন্দ্রীয় সরকারী স্বাস্থ্য কর্মী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা)। ওর ফোনেই জানলাম সেই দুঃসংবাদটি—কমরেড তৃপ্তি ত্রিবেদী আর নেই। ভোর ৫-৪৫ মিনিটে সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। যেহেতু বেশিরভাগ সময়ে আমি কলকাতার বাইরে থাকি তাই আমার খবরটা পেতে অসুবিধা হতে পারে সেটা ভেবেই কমরেড রামকিষাণজী দ্রুত আমাকে খবরটা দিয়েছেন। খবরটার মধ্যে একটা আকস্মিকতার ছোঁয়া ছিল। কারণ কিছুদিন আগেই রিপোর্ট পেয়েছিলাম যে তৃপ্তিদার রিকভারিটা বেশ স্থায়িত্ব পেয়েছে এবং পুরো পরিবারকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করে সুস্থ শরীরে ফিরেছেন। অবশ্য ক্যান্সার রোগের 'রিকভারির' উপাখ্যান এর আগেও আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। এবারেও আবার সেই ধরণের ধোঁকাই খেলাম।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই ২৮ জুলাই আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন ও পার্টির পথিকৃৎ কমরেড চারু মজুমদারের শহীদ দিবসে তথা আমাদের পার্টির পুনর্গঠন দিবসে আমরা আমাদের সংকল্পকে নবীকরণ করব এবং কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারিত সক্রিয়ত কর্মধারাকে আয়ত্ত করব। ঠিক তার পূর্বলগ্নেই আমরা হারালাম একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা তথা আমাদের পার্টির বিশ্বস্ত ও পোড় খাওয়া সৈনিক কমরেড তৃপ্তিদাকে।

আমার সঙ্গে তৃপ্তিদার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় গত শতকের '৮০-র দশকে। যতদূর জেনেছি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত টেঁয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন রাজারা পূজা করানোর জন্য পুরোহিত রূপে কনৌজের ব্রাহ্মণদের এনেছিলেন। তারপর কয়েক প্রজন্মের আত্মীকরণের প্রক্রিয়ায় তারা কার্যত বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। খুব বেশী হলে বলা যায় যে তারা "ডোমিসাইল" বাঙালী। আজ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় ত্রিবেদী, দুবে, তিওয়ারি ইত্যাদি পদবী সম্পন্ন যাদের আমরা দেখি তাদের পৃষ্ঠভূমি মোটামুটি এই রকমের। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েও বলাই বাহুল্য রক্ষণশীলতার বন্ধন ছিঁড়ে অল্পবয়স থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্তিবাদী মনন তথা প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তৃপ্তিদার বাবা চেয়েছিলেন, ছেলেকে ডাক্তার করতে; আর জি কর মেডিকাল কলেজে ভর্তিও করানো হল তৃপ্তিদাকে। কিন্তু সময়টা ছিল '৬০-এর দশকের শেষ ভাগ। নকশালবাড়ীর প্রভাবে উত্তাল বাংলা, বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজের চোখে তখন বিপ্লবের স্বপ্ন। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর কারখানা রূপে মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে নকশাল জন্ম দেওয়ার সূতিকাগারে। আর জি কর-ই বা কিভাবে ব্যতিক্রম হবে। স্বভাবতই, সেই সময়ের ছাত্র তৃপ্তিদা নকশাল আন্দোলনে সামিল হওয়া—পুলিশের নজরে পড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

তৃণমূলী সাংসদের ফৌজদারি বিচার চাই

সাংসদ তাপস পাল ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা সরকারের আরও একবার আদালতে ঠোক্কর খেতে হল। কলকাতা হাইকোর্টের এক সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি যথার্থই এক নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তাপস পালের বিরুদ্ধে নথীভুক্ত জিডি-কে এফ আই আর হিসেবে গণ্য করতে হবে। বিচারপতি নির্দেশ দানের আগে কিছু প্রশ্ন তুলে সরকারপক্ষকে জেরবারও করেছেন। তাপস পালের বিরুদ্ধে থানায় যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাকে পুলিশ-প্রশাসন এফ আই আর হিসেবে গ্রাহ্য করেনি কেন? অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত থেকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এইসব প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্ট বিচারালয়ের বিচারপতি। প্রহসনের বিষয় হল, সরকারি কৌসুলি কোনো যুক্তিসম্মত কৈফিয়ৎ দিতে পারেননি। তিনি উল্টে অভিযুক্তের সপক্ষে সাফাই গাইতে বলেছেন, যদিও সাংসদ পালের মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়, তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা করা ঠিক হয়নি, তথাপি যেহেতু তার পরবর্তী কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরী হয়নি এবং স্বয়ং সাংসদ বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাই তাঁর বিরুদ্ধে আর প্রশাসনিক বা আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। সরকারি কৌসুলি আরও ঔদ্ধত্যের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এই বলে যে, বিচারপতির নির্দেশে সরকার-পুলিশ-প্রশাসন সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কৌসুলি যা বলেন সেটা সরকারের ভাষ্য, বলাবাহুল্য যে তা শাসকদলেরও ভাষ্য। যে বিচারপতি এই ইস্যুতে ন্যায়-নীতি-নৈতিকতাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে আপসহীন স্থান দেওয়ার হিম্মৎ দেখালেন, তিনি একইভাবে পাড়ুই হত্যাকাণ্ডের মামলাতেও শাসকপক্ষের অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে বিচারের সাহস দেখিয়ে যথেষ্ট প্রখ্যাতি লাভ করেছেন। পাড়ুই মামলায় বিচারে সুবিধা পাওয়ার মরীয়া চেষ্টায় শাসকদল ও সরকার যেমন মামলাকে সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে নিয়ে যাওয়ার চালবাজী চালিয়েছে; তাপস পাল কেসেও দেখা যাচ্ছে শাসকপক্ষ শুরু করেছে আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করতে যাওয়ার সেই একই লুকোচুরির খেলা। এ প্রসঙ্গে নদীয়া জেলায় সম্প্রতি স্থানান্তরিত পুলিশ সুপারের 'নিরীহ' দাবি, তাঁদের কাছে হাইকোর্ট সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের প্রতিলিপি এখনও আসেনি, তাই কিছুই করার নেই। আসলে তাঁকে কুশলী থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শাসকদল ও প্রশাসনের ওপর মহল থেকে। সুপার সাহেব সেইমতই খেলছেন। ইনিই এই জমানায় শাসকপক্ষকে সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দেওয়ার অন্যতম এক পুলিশ অফিসার, যিনি সারদা তদন্তে—তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতা-চাঁইদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সন্দেহের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকতেই পারে আরও এই কারণে যে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার দল সারদা তদন্তে নামার-আসার নির্দেশ পেয়েছে দেখেই সাত তাড়াতাড়ি বিধাননগর কমিশনারেটে থাকা ঐ গোয়েন্দা প্রবরকে নদীয়ার পুলিশ সুপার করে পাঠানো হয়েছে। তিনি তো অতএব তাপস পাল কেসে উদাসীন নিষ্ক্রীয় থাকবেনই! এমনটা প্রবণতা বুঝেই হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি এফ আই আর লাণ্ড করার নির্দেশদানের মধ্যে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকাকে একহাত নিয়েছেন। তাপস পালের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক শাস্তি গ্রহণের দাবি তুলে থানায় যে জিডি হয়েছে তাকে নস্যাৎ করতে যার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলার শুরু তাঁকে মামলাবাজ 'পাগল' প্রতিপন্ন করার কসরৎ চলছে। পরন্তু থানায় জিডি করা হয়েছে, এমনকি বারবার বিক্ষোভ করা হয়েছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকেও। প্রত্যুত্তরে সি আই অজুহাত দেখিয়েছেন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়, ওপরতলার নির্দেশ নেই। প্রশ্ন উঠছে, অভিযুক্ত তাপস পাল তৃণমূলের কর্মসূচীতে গিয়ে অপরাধমূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি মন্ত্রীও নন। কিন্তু তাঁকে রেহাই পাইয়ে দিতে মামলায় সরকার শরিক হবে কেন? যে প্রত্যুত্তর মিলেছে শাসকপক্ষের দিক থেকে সেখানে যুক্তির জোর নেই, রয়েছে গা জোয়ারি।

হুমকীর দৌড় দেখাতে সাংসদ তাপস পাল নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন তিনি 'চন্দননগরের মাল', মানে মস্তান, যার হাতে রয়েছে গণধর্ষণকারি বাহিনী। তাপসের হুমকী অনুব্রত-মনিরুলদের অনুসারী, যেমন অনুব্রত-মনিরুলদের হুমকী আরাবুল-মুন্নাভাইদের অনুগামী। তাপসের হুমকীর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হল রাজ্যজুড়ে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ-গণধর্ষণ-হত্যা-লাশগুম-ফতোয়ার সালিশী। বহুক্ষেত্রেই জড়িত তৃণমূলীরা। শাসকদলের বিচারালয়ে একমাত্র একক নেত্রীর লোকদেখানো বকুনিতে কি বিচার সারা হয়ে গেছে সেটা তাদের দলের ব্যাপার। ফৌজদারী আইন-আদালতের বিচার রয়েছে বাকী। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আদালত যে অভিযোগের বিচারের দাবি রাখে সেটা হল তৃণমূলী শাসক রাজনীতির অপরাধীকরণ ও অপরাধীদের রাজনৈতিক মদতদানের বিরুদ্ধে।

ব্রিকস শীর্ষ বৈঠক
সম্ভাবনা ও সহজাত সীমাবদ্ধতা

ষষ্ঠ ব্রিকস শীর্ষ বৈঠক ব্রাজিলে সংগঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরপরই ব্রাজিলেরই ফোর্তালেজায় অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪-র ১৫ জুলাই। ফোর্তালেজা শীর্ষ বৈঠক থেকে এক ৭২ দফা ঘোষণা এবং ২৩ দফা কর্মপরিকল্পনা বেরিয়ে আসে। এই বৈঠকের পর ব্রাজিল সহ দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক ফোরাম ইউনাসুর-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও একটি বৈঠক হয়। ষষ্ঠ ব্রিকস বৈঠকের সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিষয় হল ব্রিকস ব্যাঙ্ক—যার নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং জরুরী প্রয়োজন নিমিত্ত সঞ্চয় ব্যবস্থা নামে একটি যৌথ তহবিল গঠনে সম্মত হওয়ার ঘোষণা, যার লক্ষ্য হল বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি জনিত সাময়িক চাপের মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলোকে সাহায্য করা।

ব্রিকস পাঁচটি দেশকে নিয়ে গঠিত আন্ত-মহাদেশীয় এক অভিনব জোট, যে দেশগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বা ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। এটা বিকাশমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট এক প্রতিফলন যেখানে বিশ্ব অর্থনীতির প্রাক্তন ও বর্তমান দু-নম্বর যথাক্রমে রাশিয়া ও চীন বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশের আরও তিনটি উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের সুরক্ষায় হাত মিলিয়েছে। এটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে এই জোট বিশ্ব আর্থিক সংকটের পৃষ্ঠভূমিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে, যে সংকট এই উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর তুলনায় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথাগতভাবে শক্তিশালী তিনটি কেন্দ্রকেই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান—বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ব্রিকস ঘোষণার মধ্যে আমূলপন্থী বিকল্প অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন লক্ষণকে খোঁজার চেষ্টা করলে ভুল হবে। ব্রিকস-এর পাঁচ সদস্যই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বর্তমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একীকৃত হয়ে আছে। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমের অন্যান্য শক্তিগুলোর একতরফা আধিপত্যের বিপরীতে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বহুপাক্ষিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা, ডলার এবং ফাণ্ড-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকাশশীল দেশগুলোর অধিকতর স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং ফাটকা বিত্তিয় পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আধিপত্যের বিপরীতে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান আর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ—এই সমস্ত দিক থেকে বিশ্বায়নের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

ব্রিকস-এর সম্ভাবনার পথে প্রকৃত চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সদস্য দেশগুলোর, বিশেষভাবে ভারতের অসঙ্গতিপূর্ণ রণনৈতিক অগ্রাধিকারের মধ্যে। ফাণ্ড-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিপর্যয়কর আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্রিকসকে বিশ্বের দরিদ্র দক্ষিণের অর্থনৈতিক সহযোগিতার মঞ্চ হিসাবে বিকাশলাভ করতে হলে বর্শামুখকে ধারাবাহিকভাবে চালিত করতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ভারতের শাসক শ্রেণীগুলো কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়া দিল্লীর রণনৈতিক অংশিদারিত্বের (যা বশ্যতার অন্য নাম) মধ্যেই বাঁধা পড়ে আছে। ভারত মার্কিনপন্থী বিদেশনীতি অবিচল অনুগামী হওয়ায় নয়া উদারবাদের কাঠামোগুলোর সঙ্গে ভারতের শাসক শ্রেণীগুলোকে আরও বেশি একীকৃত করে তুলছে এবং তা ব্রিকসের এক দায়বদ্ধ পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠার পথে ভারতের সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত করছে।

ব্রিকস নিয়ে মোদীর অন্তঃসারশূন্য বড়াই এবং গাজার উপর ইজরায়েলি যুদ্ধের ইস্যুতে ভারতের কলঙ্কজনক নীরবতা এবং এমনকি নিরপেক্ষতার পক্ষে ওকালতি করা—এই দুয়ের মধ্যে বৈপরীত্য ভারতীয় শাসক শ্রেণীগুলোর বিদেশ নীতি নিয়ে কপটতাকে আরও একবার উন্মোচিত করে দিয়েছে। মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের জায়নবাদী আগ্রাসনের মুখে প্যালেস্তিনীয় জনগণের শান্তি, মর্যাদা এবং স্বাধীনতার পরিপূর্ণ অধিকারকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে এবং তার সপক্ষে দাঁড়াতে বিজেপির অক্ষমতা, বলা ভালো অস্বীকার করাটা বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বের দরিদ্র দক্ষিণের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ানোর হাবভাবের অন্তঃসারশূন্যতাকেই দেখিয়ে দেয়।

সারা বিশ্বে বহুমেরুতা এবং ফাণ্ড-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উৎপীড়নমূলক আধিপত্য এবং ডলারের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিকস তাৎপর্যময় হয়েই দেখা দিচ্ছে; আর তাই বিশ্বের দরিদ্র দক্ষিণের আরও বেশি আত্মঘোষণার ব্রিকস-এর মূল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভারতের অর্থনৈতিক ও বিদেশ নীতির পুনর্বিন্যাস ঘটানোর লক্ষ্যে ভারতের অভ্যন্তরে জনগণের আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে হবে। ব্রাজিল ব্রিকস সংগঠনে তার ভূমিকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংহতি গড়ে তুলেছে; ভারতকেও ব্রিকস-এর প্রতি তার দায়বদ্ধতার পরিপূরক ভূমিকা হিসাবে সার্কভুক্ত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২২ জুলাই ২০১৪)

ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে না শ্রমিকরা
শ্রম দপ্তরে দাবিপত্র পেশ

আমাদের রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের বিভিন্ন জেলা দপ্তরের কাজের দীর্ঘসূত্রীতার জন্য নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন জেলায় নাম নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে তিন মাস থেকে চার মাস লেগে যাচ্ছে। কল্যাণ পর্ষদে নাম নথিভুক্তিকরণের পরে প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার আবেদন করার পরেও মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। তবুও অনেক শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে বিভিন্ন বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পে ঠিকাদাররা নির্মাণ শ্রমিকদের ঠিকাদাররা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দিচ্ছে না এবং আইন মোতাবেক বিভিন্ন সুবিধাও শ্রমিকরা লাভ করছেন না। এমনকি যেখানে সরকারি প্রকল্প হচ্ছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীও এই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন। শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন সার্কুলারেও (উদাহরণ স্বরূপ নং ১১৩৭-আই আর/আই আর/এম আই এস সি-১১/১১, তারিখ ১৪/১১/২০১১) শ্রমদপ্তর সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে ঠিকাদারদের শ্রম আইন লঙ্ঘন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ইউনিয়নের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ জুলাই দাবিপত্র পেশ করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকার, সভাপতি প্রবীর দাস, কার্যকরী সভাপতি দ্বৈপায়ন ও রাজ্য কমিটির সদস্য নীহার ব্যানার্জী, কাজল দত্ত ও স্বপন রায়চৌধুরী। তারা তথ্যপ্রমাণ পেশ করে দাবি করেন অবিলম্বে নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ পর্ষদে নাম নথিভুক্তিকরণ ও সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতার অবসান ঘটাতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বিভিন্ন শূন্যপদগুলোতে নিয়োগ এবং নিয়মের ক্ষেত্রে জটিলতা লাঘব করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অবসানের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদে আমাদের প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

শ্রম আধিকারিক ইউনিয়নের চাপে জেলায় জেলায় ফোন করে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন ও জেলা দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠান। ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা তাকে জানান সামনের দিনে শ্রমিকদের এইভাবে বঞ্চনা চলতে থাকলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাবেন।

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

ভারতীয় কৃষি ও কৃষক জনগণের চরমতম দুর্দিনের মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ান

নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকারের ২ মাস পূর্ণ হল। সরকার জনগণের কেমন 'সুদিন' নিয়ে আসছে সেটা ট্রেন ভাড়া বৃদ্ধি, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৬ থেকে ৪৯ শতাংশ করা এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে না পারা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। ১০ জুলাই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পেশ করা সাধারণ বাজেটে আর্থিক ও শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক ক্ষেত্রে এই সরকারের গৃহীত নীতির ভালরকম প্রকাশ ঘটেছে। বাজেটের আগের দিন ৯ জুলাই আর্থিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও আনুষাঙ্গিক কার্যকলাপের ভাগ ২০১৩-১৪ সালে মাত্র ১৩.৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। অথচ সমগ্র দেশে কৃষি থেকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় ৫৫ শতাংশের। কৃষিজীবির সংখ্যা ১২.৭৩ কোটি থেকে কমে ১১.৮৭ কোটি হয়েছে। এটা সরকারি মতে কৃষিজীবির সংখ্যা। সামাজিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয়কে ১০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪.৪২ শতাংশ করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজে শহর ও গ্রামীণ কৃষিমজুর ও মেহনতী জনগণ সব থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীতিন গড়করি যে নতুন নীতিমালা তুলে ধরেছে, তাতে এই প্রকল্প তুলে দেওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে। দেশে ৬,৫৭৬টি ব্লকের মধ্যে পিছিয়ে পড়া ২৫০০ ব্লকেই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পটি চলবে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪২টি ব্লকের মধ্যে ১২৪টি ব্লক পিছিয়ে পড়া হিসাবে ধরতে হবে। যোজনা কমিশনের ঠিক করে দেওয়া পদ্ধতি মেনেই বাছাই করতে হবে পিছিয়ে পড়া ব্লক। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই কাজ হবে। প্রকল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হবে তার ৬০ শতাংশ প্রশাসনিক খরচ। জাতীয় ও রাজ্যে রাস্তার ধারে গাছ লাগানো, খাল কাটা, বাঁধ, জমি উন্নয়ন প্রভৃতি ধরণের কাজ করা হবে। যোজনা কমিশনের নির্দেশ মেনে ঠিক হবে কারা কারা ১০০ দিনের কাজ পাবেন।

২১ জুলাই ২০১৪ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৫ সালের কেন্দ্রীয় আইনের ২৯ নম্বর ধারার ১ নং উপধারার সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে সংশোধনী আনার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি বা সেই সংক্রান্ত বিষয়ে ৬০ শতাংশ কাজ করার ১ নং তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১নং তপসিল অনুযায়ী চার ধরণের কাজ করার কথা আছে। জনস্বার্থজনিত কাজ, পিছিয়ে পড়া মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির কাজ, গ্রামের মানুষের স্বার্থে জীবনযাপনের মান উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের কাজ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ। নতুন সংশোধনীতে বলা হয়েছে, পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাজ করা যাবে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের মাধ্যমে। পশুপালন, মৎস্য চাষের পরিকাঠামো তৈরী প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ১০০ দিনের কাজে কৃষিমজুর ও মেহনতী জনগণের জীবনধারণের সুযোগ পাচ্ছিল তা যেমন দেশের ৩ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ ব্লকে করার পথে নিয়ে যাওয়া হল, তেমনি 'সকলের হাতে কাজ-সকলের জন্য খাদ্য' নীতি থেকে বিজেপি সরকার সরে এল। জব কার্ড অনুযায়ী কাজ না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে বেকারভাতা দেওয়ার সমস্যা এবং কাজের সাথে সাথে মজুরি পাওয়ার সমস্যাগুলোতে সরকার কোন রেখাপাত করেনি। দারিদ্র সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কম করে দেখানোর মাধ্যমে এই প্রকল্পকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হবে। যা ভারতীয় অর্থনীতির স্বাধীনভাবে বিকাশের পথে বাধা। কাজেই কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি উপর্যুপরি আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছে। আমাদের কৃষিমজুর সংগঠনকে বিজেপি সরকারের পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে এবং গ্রামীণ গরিব জনগণকে সমাবেশিত করতে হবে।

মোদী সরকার নতুন করে এস ই জেড ও জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের স্বার্থে নতুন জমিনীতি গ্রহণ করার আভাস দিয়েছে। আইন মন্ত্রকের মাধ্যমে মোদী সরকার জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে মনমোহন সরকার প্রণীত আইন সংশোধনে তৎপর হচ্ছে। পি পি পি মডেলে সম্মতির জন্য ৮০ শতাংশ নয়, কৃষককের মতামত ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা তোলা হয়েছে। শিল্পপতিদের চাপে জমির জন্য ক্ষতিপূরণের শর্ত ও অর্থ কমিয়ে দেওয়ার ভাবনা শোনা যাচ্ছে। অরণ্য আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন শিথিল করার কথা হচ্ছে। আজ যখন কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে এবং কৃষকরা কৃষিতে লাভ করতে পারছে না তখন সেই ব্যাপারে মনযোগী না হয়ে কর্পোরেটের স্বার্থে বিপরীত দিকে যেতে শুরু করেছে। যেখানে এ বছরে আর্থিক সমীক্ষায় দেখা গেছে চালের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১.৫৫ শতাংশ কমেছে। তেমনি গম ১.৭৫ শতাংশ, ডাল ২.৪১ শতাংশ, তৈলবীজ ১.৬৩ শতাংশ, ছোলা ৫.৯৮ শতাংশ উৎপাদন কমেছে। যা বিরাট উদ্বেগজনক।

সারা দেশে প্রতিবাদ এবং কৃষি বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনেটিক বীজের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। গত ১৮ জুলাই পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেগুলারি বডিতে চাল, সরিষা, তুলা, ছোলা, বেগুন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জি এম বীজের বিস্তারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। যা পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন জি ই এ সি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাপ্রুভাল কমিটি) ইতিমধ্যে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। কি ভিত্তিতে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে তার কোন রিপোর্ট নেই। বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও মানা হয়নি।

২০১৪, ৭ এপ্রিল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, ''মাটি, উৎপাদন ও উপভোক্তাদের শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কি পড়তে পারে তার সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ছাড়া জি এম খাদ্যোৎপাদন কখনই অনুমোদন করা হবে না''।

বিজেপির ইস্তাহারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা এবং এই বীজে কি ক্ষতি হতে পারে তা বিশদ জেনে তবেই অনুমোদন দেবে বলা হয়েছিল। তারপরে এখন দেশের কর্পোরেট সংস্থা ও আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানীর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এবং ভারতীয় কৃষির কাঠামোগত সমস্যা দূর করার বদলে বিজেপি সরকার জিন প্রযুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত বীজকে কৃষি ক্ষেত্রে লাগু করে তার সমাধান চাইছে। তুলা চাষে মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্রপ্রদেশে, পাঞ্জাবের মালোয়া অঞ্চলে কৃষকদের আত্মহত্যা, ব্যাপক কৃষক জনগণ ক্যানসারের দ্বারা আক্রান্ত এইসব জানা সত্ত্বেও বিজেপি সরকার মনসান্টো, ওয়ালমার্ট প্রভৃতিদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে।

তাই খাদ্য ও বাণিজ্যিক উভয় শস্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের জি এম জৈব বীজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বত্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত করতে হবে। ভারতের শাসকশ্রেণী 'জ্ঞান চুক্তির মাধ্যমে' কৃষি বিজ্ঞানীদের আমাদের দেশীয় কৃষিকে উন্নত করার পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের তারও বিরোধিতা করতে হবে। দেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের নবম পার্টি কংগ্রেসে দলিলে ''কৃষিতে পরিবেশ দূষণজনিত প্রস্তাবে'' উল্লেখ করা হয়েছে, ''আন্তর্জাতিক কৃষি-বাণিজ্য লবির চাপিয়ে দেওয়া কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত ও প্রযুক্তিবহুল সমাধানের বিরোধিতা করার সাথে সাথে আমাদের দাবি জানাতে হবে কৃষি বিকাশের বিকল্প পথ গ্রহণের। যা হবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীন, রাষ্ট্রকর্তৃক বিনিয়োগকৃত পুঁজি ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে। দেশজ বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ এবং হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় কৃষকদের অর্জিত জ্ঞান ও দেশপ্রেমিক কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ওপর ভর করে অবশ্যই এই বিকল্প সম্ভব।'' যখন কৃষিতে উৎপাদন কম হচ্ছে, তখন চাষিদের উৎপাদিত ফসলের সহায়ক মূল্য বাড়ানো এবং সারের ও কীটনাশক ক্ষেত্রে ভর্তুকি বৃদ্ধি করে চাষীদের সংকট থেকে মুক্ত করার দিকে মোদী-জেটলি হাঁটতে চায়নি। আমেরিকা কৃষিতে ১২,০০০ কোটি ডলার ভর্তুকি দেয়, অথচ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ভারতবর্ষে কৃষিতে ভর্তুকি মাত্র ১২০০ কোটি ডলার। এবারেরও বাজেটে সারের ভর্তুকি গতবারের মতই ৬৭,৭৯১ কোটিতেই রাখা হল। যেখানে তার ভর্তুকি বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদনে সরকারি অবদান বাড়ানো দরকার ছিল। উল্টে পেট্রোলিয়ামের ওপর ভর্তুকি ২২.০৩৪ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। ডিজেল-কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি কৃষক ও গ্রামীণ সমাজে সরাসরি প্রভাব পড়বে।

'কংগ্রেস মুক্ত ভারত' গড়ে তোলার আহ্বান নরেন্দ্র মোদী দিলেও সেই কংগ্রেসের চলা নয়া উদারনীতির পথেই বিজেপি চলতে শুরু করেছে। কর্পোরেটদের কর ছাড়ের মাত্রা বজায় রেখে ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে কৃষক জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ শুরু হয়েছে। আমাদের পার্টি, কৃষিমজুর ও কৃষক সংগঠন সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। আগামী ৯ আগস্ট 'সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনার ঐতিহাসিক দিনে সারা ভারত কিষাণ মহাসভা বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট ও শিল্পপতিদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণের নীতি সংশোধন করে ৫০ শতাংশ কৃষক জনগণের মতামত নেওয়া এবং কৃষক জনগণের ক্ষতিপূরণের মাত্রা কমিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে তার বিরোধিতা করে কৃষি জমি অধিগ্রহণ রোধ ও কৃষি জমি সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের এবং ''জি এম জৈব বীজ'' ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সংগঠিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী জেলা শাসকের সামনে ২০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ও ৩০০ টাকা মজুরি, যথাসময়ে মজুরি, দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি সরকারের এই প্রকল্প তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বিজেপি শাসন ও তার রাজনীতি, বিভিন্ন প্রশ্নে নীতি-পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াইকে ব্যাপক গণভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এই লড়াই কৃষিমজুর ও কৃষক জনগণের সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য স্তর—নির্মাণ শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, ছাত্র-যুব-মহিলাদের সামিল হতে হবে। 'সুদিনের' শ্লোগান দিয়ে আজ যেভাবে জনজীবনে ঘোর দুর্দিন নিয়ে আসতে হামলা নামছে, অপরদিকে কর্পোরেট জগত ও শিল্পপতিদের এবং বিদেশী পুঁজির সুদিন করে তোলা হচ্ছে তার বিরোধিতা করা আজ প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক জনগণের কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে আমাদের পার্টিকে তার অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

- কার্তিক পাল

আই এল ও স্বীকৃত অধিকার লাগু না করার প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যুক্ত সভা

গত ২৭ জুলাই উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরে জেলা ট্রেড ইউনিয়ন শাখাগুলোর জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরামের যুক্ত সভা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো উপরোক্ত ফোরাম গঠন করেছে। আই এল ও রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত সংস্থা। এই সংস্থায় ১৮৭টি দেশ, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক কমিটি তৈরী হয়েছে। আই এল ও যে মিটিংগুলো করে তা কনভেনশন হিসেবে পরিচিত। ভারত সরকার যেহেতু কনভেনশনগুলো লাগু করছে না তার বিরুদ্ধেই অনুষ্ঠিত হল শ্যামনগরের যুক্ত সভা।

কনভেনশন নং ৮৭ (১৯৪৮, শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার অধিকার), কনভেনশন নং ৯৮ (১৯৪৯, সংগঠিত হওয়ার ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার), কনভেনশন নং ১০০ (১৯৫১, সমকাজে সম মজুরি পাওয়ার অধিকার), কনভেনশন নং ১০৫ (১৯৫৭, দাস শ্রমিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি), কনভেনশন নং ১৩৮, (১৯৭৩, কাজের ন্যূনতম বয়স), কনভেনশন নং ১৮২ (১৯৯৯, শিশুশ্রমের বিলোপসাধন)। যুক্ত সভা থেকে উপরোক্ত কনভেনশনগুলোর পরিপূর্ণ প্রয়োগের দাবি করা হয়। বক্তব্য রাখেন জয়শ্রী দাস, নারায়ণ দে (এ আই সি সি টি ইউ), অমল সেন (এ আই ইউ টি ইউ সি), গার্গী চ্যাটার্জী (সিটু), লিয়াকত আলী (এ আই টি ইউ সি), কল্যাণ সেনগুপ্ত (ইউ টি ইউ সি), রাম অবতার প্রসাদ (টি ইউ সি সি)। প্রাণবন্ত আলোচনায় সভার আয়োজন সফল হয়ে ওঠে।

২৯ জুলাই বেলঘরিয়ায় সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠনগুলি প্যালেস্তাইন থেকে ইজরায়েল হাত ওঠাও দাবিতে যুক্ত মিছিল সংগঠিত করে।

পাওয়া যাচ্ছে
চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার
মূল্য ঃ ৩০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

২৮ জুলাই কমরেড চারু মজুমদারের শহীদ দিবস স্মরণ

দার্জিলিং ঃ মোদি সরকারের কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে শিলিগুড়িতে পালিত হল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কমরেড চারু মজুমদারের ৪৩তম শহীদ দিবস।

২৮ জুলাই বিকাল ৫-৩০-এ শহরের সুভাষপল্লী এলাকায় স্থাপিত প্রয়াত নেতার মূর্তির পাদদেশে শুরু হয় সভা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষক, কৃষি মজুর, চা বাগান শ্রমিক, মেহনতী মানুষ আবেগদীপ্ত শ্লোগান তুলে জড়ো হতে থাকে নির্দিষ্ট স্থানে। এই জমায়েতে লড়াকু মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত। কমরেড চারু মজুমদারের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটি সদস্য গৌরী দে, বাসুদেব বোস, পবিত্র সিংহ, অভিজিৎ মজুমদার, জেলা কমিটি সদস্য কল্লোল চক্রবর্তী, অপু চতুর্বেদী, মোজাম্মেল হক, মুক্তি সরকার, কান্দ্রা মুর্মু, বন্ধু বেক, লালু ওরাওঁ, চানেশ্বর সিংহ, যুব নেতা অনীক চক্রবর্তী, প্রলয় চতুর্বেদী, মহিলা নেত্রী মীরা চতুর্বেদী, ছাত্র নেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী প্রমুখ।

সভার শুরুতে গণসঙ্গীত গেয়ে শোনান মীরা চতুর্বেদী। বক্তব্য রাখেন অপু চতুর্বেদী, গৌরী দে, পবিত্র সিংহ, বাসুদেব বোস ও অভিজিৎ মজুমদার।

ব্যস্ত শহরের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সভায় পার্টি সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনেক পার্টি দরদী মানুষ। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা আগ্রহের সঙ্গে সভার বক্তব্য শোনেন ও চর্চা করেন।

কুচবিহার ঃ ২৮ জুলাই সকালে কুচবিহার জেলা পার্টি অফিস ও ভেটাগুড়ি লোকাল কমিটি অফিসে পতাকা উত্তোলন করা হয়। কমরেড চারু মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ও বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটি সদস্য রাজু গোস্বামী, প্রজাপতি দাস, মুকুল, দর্পহরি প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি ঃ শহরের জেলা পার্টি অফিসে সকালে পতাকা উত্তোলন ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সুভাষ দত্ত, বিজন সরকার, প্রদীপ গোস্বামী, মাণিক দাস প্রমুখ। ময়নাগুড়ি পার্টি অফিসেও পতাকা উত্তোলন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ধর্মপুর অঞ্চলে পতাকা উত্তোলন ও বক্তব্য রাখেন শ্যামল ভৌমিক। সাপটিবাড়িতে পতাকা উত্তোলন করে বক্তব্য রাখেন ভাস্কর দত্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাখরাহাট, বজবজ পার্টি অফিসে সকালে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে বজবজ পার্টি অফিসে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাটি পরিচালনা করেন সি পি আই (এম এল) বজবজ লোক কমিটির সম্পাদক দেবাশিষ মিত্র। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান পাঠ করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটি সদস্য অতনু চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার ও দিলীপ পাল। সভাটি খুব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

হুগলী

২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানের মর্মবস্তুকে ধরে হুগলী জেলার বিভিন্ন ব্লক ও এলাকার ব্রাঞ্চ স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জেলার শহরাঞ্চলের কোন্নগর-হিন্দমোটর লোকাল কমিটি মহিলা নির্যাতন, বন্ধ কারখানা খোলা সহ জনগণের বিভিন্ন জ্বলন্ত দাবিতে আন্দোলনরত। এই অঞ্চলে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন স্বপন মজুমদার, ভালো সংখ্যক উপস্থিত মহিলা ও ছাত্র এবং শ্রমিক কমরেডরা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। চুঁচুড়া দলীয় কার্যালয়ে সকালে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মরণ এবং বিকালে বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য নিয়ে কর্মী বৈঠক হয়, পতাকা উত্তোলন করেন স্বপন গুহ আর বিকেলে আলোচনা সঞ্চালনা করেন কল্যাণ সেন।

শহীদ দিবসে ''জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ'', চারু মজুমদারের শেষ লেখার এই শিক্ষা ব্রাঞ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া ও কার্যকরী করার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া

শিলিগুড়ি শহরে কমরেড চারু মজুমদারের শহীদ স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য কমিটি ও দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য পবিত্র সিংহ। আলোকচিত্রী ঃ শাশ্বতী সেনগুপ্ত

হয়। বলাগড় ব্লকের ইটাগড়, গুপ্তিপাড়া, ইলমপুর, ভালকি-কুলগাছি এলাকায় কর্মীদের স্বাধীন উদ্যোগে ব্রাঞ্চ স্তরে শহীদ স্মরণ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার নিয়ে আলোচনা হয়। ভালকি-কুলগাছি ব্রাঞ্চের মহিপালপুর হাটতলায় পতাকা উত্তোলন করেন মহাদেব বাউলদাস, কুলেপাড়ায় পতাকা উত্তোলন করেন চৈতন্য মাণ্ডি, এই এলাকায় মহিলা নির্যাতন ও জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে স্কোয়াড মিছিল করা হয়। ফিডার রোডে চারু মজুমদারের আবক্ষ মূর্তির সামনে শহীদ স্মরণ কর্মসূচী পালিত হয়, উপস্থিত ছিলেন সংগঠক সজল দে। শহীদ দিবসে আলোচনা সংগঠিত হয় দাদপুরের মাকালপুর ব্রাঞ্চে। পাণ্ডুয়া ব্লকের বৈঁচী, ইলছোবা, সাঁচিতারা, দ্বারবাসিনীর ব্রাঞ্চ স্তরে কর্মসূচী পালিত হয়। ইলছোবায় পতাকা উত্তোলন করেন সমীর গোস্বামী, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সিরাজুদ্দিন ও সংগঠক বিনয় বাউলদাস। সাঁচিতারায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে পতাকা তোলেন মানিক সাঁতরা, উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংগঠক ও জেলা কমিটি সদস্য নিরঞ্জন বাগ। এই দুই এলাকাতেই গ্রামীণ প্রকল্প তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মিছিলের কর্মসূচী গৃহীত হয় যা ৩১ জুলাই ও আগস্টের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঁচীতেও হিমঘর ও গ্রামীণ শ্রমিকদের দাবিতে মিছিল হবে। দ্বারবাসিনীতে প্যালেস্তাইনের উপর ইজরাইলের জঘন্য আক্রমণের ও বাজেটের বিরুদ্ধে পথসভা হয়, বক্তব্য রাখেন শুভাশিস চ্যাটার্জী। ভদ্রেশ্বর শ্রমিক অঞ্চলের এ্যাঙ্গাস ব্রাঞ্চের পক্ষে কারখানার গীর্জা গেটের কাছে শ্রমিক মহল্লায় এবং ভদ্রেশ্বর ব্রাঞ্চের পক্ষে শ্যামনগর নর্থ জুটমিল গেটে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়, শ্রমিক সংগঠক বটকৃষ্ণ দাস, সুদর্শন সিং-এর উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে বদ্রী সাহানি ও কপিল সাউ। জেলা জুড়ে গোটা কর্মসূচীতে পার্টি গঠন, সদস্যদের সাংগঠনিক চেতনা উন্নত করা, রাজনৈতিক মান বাড়ানো, পঞ্চায়েতে বুথভিত্তিক কাজ ও ব্রাঞ্চের স্বাধীন উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া হয়।

হাওড়া

২৮ জুলাই শহীদ দিবস হাওড়া জেলার সর্বত্রই পালন করা হয়, সকালে বালী, মধ্য হাওড়া, বাগনান ও আড়ুপাড়া অঞ্চলে শহীদ বেদীতে কমরেড চারু মজুমদার সহ অন্যান্য শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ, রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। বাঙ্গালপুর-হাটুরিয়া অঞ্চলে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বাঙ্গাল পুর-হাটুরিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক দিলীপ দে, জেলা কমিটির সদস্য নবীন সামন্ত ও স্বপন খাঁ। বিকেলে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান নিয়ে কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বালী অঞ্চলে কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্যাণ গোস্বামী, মধ্য হাওড়া ও আড়ুপাড়া অঞ্চলে কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য মীনা পাল এবং বাগনান-বাঙ্গালপুর অঞ্চলে কর্মী বৈঠকে ছিলেন জেলা সম্পাদক দেবব্রত ভক্ত। আড়ুপাড়া-মধ্য হাওড়ার বৈঠকে চারু মজুমদারের লেখা ''জনগণের স্বার্থ পার্টির স্বার্থ'' লেখাটি অধ্যয়ন করা হয়। কর্মী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আলাপ-আলোচনায় সভাগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান সামনে রেখে আগামীদিনে আন্দোলনমুখী সংগঠন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই কর্মী বৈঠক শেষ হয়।

বর্ধমান

বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২৮ জুলাই সি পি আই (এম এল)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড চারু মজুমদারের মৃত্যুদিন থেকে ৫ আগস্ট কমরেড সরোজ দত্তের মৃত্যুদিন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শহীদ দিবস পালন করা; পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান নিয়ে ব্লকে ব্লকে ব্রাঞ্চ লিডিং টীমের সদস্য, লোকাল কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করা এবং পার্টির পলিটব্যুরোর সার্কুলার নিয়ে আলোচনা করা। সিদ্ধান্ত মত ২৮ জুলাই পূর্বস্থলী ২, কাটোয়া, মেমারী ২, সদর ১ এবং সদর ২-তে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শহীদ দিবস পালন করে কর্মী বৈঠক করা হয়। বৈঠকে জেলা নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান ও পলিটব্যুরো সার্কুলার পাঠ করা হয়। নেতৃত্বস্থানীয় কমরেডরা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার অভিযান সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। কালনা ২ নং ব্লকের শহীদ বেদীতে মাল্যদান, পতাকা উত্তোলন ও নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে শহীদ দিবস পালন করা হয়। ২৭ জুলাই শিল্পাঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করা হয়।

উত্তর চব্বিশ পরগণা

জেলায় পার্টির নৈহাটি লোকাল কমিটি, হুকুমচাঁদ পার্টি ব্রাঞ্চ, জগদ্দল লোকাল কমিটি, বেলঘরিয়া লোকাল কমিটি,অশোকনগর লোকাল কমিটি, গাইঘাটা লোকাল কমিটি, মধ্যমগ্রামক পার্টি ব্রাঞ্চ ও বসিরহাট লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ২৮ জুলাই শহীদ দিবস পালন করা হয়।

কলকাতা

২৮ জুলাই সি পি আই (এম এল)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড চারু মজুমদারের ৪২তম মৃত্যু বার্ষিকীতে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মৌলালীতে পার্টির রাজ্য অফিসের নীচে শহীদ বেদীর সামনে স্মরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান কমরেড এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়তু দেশমুখ, কলকাতা জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, জেলা কমিটির সদস্য দিবাকর ভট্টাচার্য, প্রবীর দাস, দ্বৈপায়ন ব্যানার্জী, অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী ও অন্যান্যরা। দেশব্রতী পত্রিকার পক্ষ থেকে অরূপ পাল, প্রতিরক্ষা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে রুপো সেনগুপ্ত ও রাজ্য অফিস পার্টি গ্রুপের সুরেশ মণ্ডল। মাল্যদান পর্ব শেষে কমরেড চারু মজুমদার সহ ভারতবর্ষের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন ও শ্লোগান দিয়ে কর্মসূচী শেষ হয়।

এছাড়াও যাদবপুর, পালবাজার ও শহীদনগরে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যায় প্রতাপগড় স্কুলে ২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান নিয়ে আলোচনা হয়। বেহালা অঞ্চলে সিরিটি কালিতলা পার্টি অফিস ও মুচিপাড়া এবং চৌরাস্তা জেমস লং সরণীতে শহীদ স্মরণ হয়, রবীন্দ্রনগরে কমরেড চারু মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বর্ষীয়ান কমরেড পরিতোষ ভট্টাচার্য। কালীতলা পার্টি অফিসে ঐ দিন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভবানীপুর, কালিঘাট এবং উত্তর কলকাতার শোভাবাজারেও শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কলেজ স্ট্রীট শহীদ বেদীর সামনে একটি দেশব্রতীর বোর্ড লাগানো হয়।

অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে এক প্রতিবাদী পথসভা করা হয়। কমরেড চারু মজুমদার সহ সত্তর দশকের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের সমস্ত শহীদদের হত্যার তদন্তের দাবি আরও একবার উত্থাপন করা হয়। এছাড়া বর্তমানে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট আগ্রাসনমুখী চরিত্র উন্মোচিত করে এই হামলাকে সর্বতোভাবে রুখে দেওয়ার আহ্বান গোটা শিক্ষার্থী সমাজের কাছে রাখে এই প্রতিবাদী কর্মসূচী। রাজ্যজুড়ে কলেজে কলেজে টি এম সি পি-র দাদাগিরি এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো টাকা চাওয়ার যে বেআইনি চক্র তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানান এ আই এস এ-র কমরেডরা। সভায় বক্তারা তুলে ধরেন আজ গোটা দেশজুড়ে যেভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বীমা সহ সবক্ষেত্রে ঢালাও বেসরকারিকরণ যজ্ঞ শুরু হয়েছে, যার ফলে আরও বেশি করে ছাত্র-যুব প্রতিদিন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের আঙিনা থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এবং তাদের এই বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে শাসকশ্রেণী বাড়িয়ে চলেছে সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের পরিসর। অথচ এস এস সি, টেট-এর যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়ে প্রতিবাদ করলেই জোটে 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'রাষ্ট্রদ্রোহী' তকমা। মুখে কর্মসংস্থানের কথা বলে আদতে ছাত্র-যুব সমাজের সাথে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর যে সীমাহীন প্রতারণা ও ভণ্ডামি তাকে রুখে দেওয়ার আহ্বান রেখে শপথ নেন কমরেডরা। একদিকে যখন মোদী ভারতকে তথ্যপ্রযুক্তিতে 'উজ্জ্বল' করার গল্প শোনান তখন অন্যদিকে পুনেতে 'সন্ত্রাসবাদী' মিথ্যা অভিযোগে তথ্য-প্রযুক্তি কর্মী মহসিন সাদিককে হত্যা করে হিন্দু রাষ্ট্র সেনা। চারু মজুমদার, সরোজ দত্তদের হত্যার ঘটনায় যে মিথ্যা কথা ও দ্বিচারিতার সাক্ষ্য রেখেছিল সিদ্ধার্থ-ইন্দিরার জমানা আজ তাদের ট্র্যাডিশন সমানতালে বইছেন 'নমো'। একে ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল)-এর দ্বৈপায়ন এবং এ আই এস এ-র পক্ষে আকাশ ও সৌরভ। সভাটি সঞ্চালনা করেন ত্রিপর্ণা।

বামপন্থার সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা

বাম বিকল্পের সন্ধানে একটি আলোচনাসভায় সম্প্রতি বক্তব্য রাখলেন দুই বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। প্রথমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বামপন্থার উৎসগত ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলার পর ভারতীয় বামপন্থার নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা বিষয়ে আলোকপাত করেন। সাধারণভাবে বামপন্থার সমস্যা নিয়ে কথা বললেও আলোচনার চলন থেকে বোঝা যাচ্ছিল মূলত সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-কে কেন্দ্র করেই তিনি মতামত পেশ করছেন। তাঁর মতে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো নব্বই দশকের পরবর্তী সময়ে বদলে যাওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে আন্দোলনের দিশা কী হবে সেটা ঠিকমত রপ্ত করতে পারেনি। রাষ্ট্র যখন ক্রমশ পিছু হটছে আর নিও লিবারেল অর্থনীতি জাঁকিয়ে বসছে তখন সংগঠন ভাবনা ও রাজনীতি ভাবনায় যে ধরণের পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল তা হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংগঠন বিষয়ে তাঁর ভাবনাকে আরও বিস্তারিতভাবে মেলে ধরে তিনি বলেন কমিউনিস্ট পার্টির গঠনের মূল কাঠামোটি বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইউরোপ, আমেরিকার কিছু দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম মাত্র। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বেশিরভাগ দেশেই ছিল হয় নিষিদ্ধ বা যে কোনও সময় নিষিদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে এড়িয়ে গোপনে কাজ করার দিকটি মাথায় রেখে সাংগঠনিক ধাঁচা তৈরি করতে হয়েছিল। এই বিষয়ে শোভনলাল দত্তগুপ্তও তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। কমিন্টার্ণ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ে নির্দেশিকা দিত। কিন্তু লেনিন নিজেই তা কতটা কার্যকরী তা নিয়ে কমিন্টার্ণের ১৯২২-এর অধিবেশনে চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন। লেনিন মনে করেছিলেন, রাশিয়ার নিজস্ব বাস্তবতা অনুযায়ী তারা কমিউনিস্ট সংগঠনের যেরকম ধাঁচা ভেবেছিলেন, সেটাকেই সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নির্বিশেষে কাঠামো বানিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পর লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কমিন্টার্ণ নেতৃত্বের তরফে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা আর এগোয় নি। কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোতেও তেমন বদল আসেনি। ষাট-সত্তরের দশকে ইউরো কমিউনিজম নানা ভাবনাচিন্তা করলে তা আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দ্বারা সমালোচিতই হয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনীতি ভাবনায় কিছু বদল আনার কথা বলেন। তিনটি বিষয়ের ওপর তিনি জোর দেন। একটি হল, অসংগঠিত কাজের যে বিস্তার তাকে মাথায় রেখে এ বিষয়ে সমধিক জোর দেওয়া। দ্বিতীয়টি হল, আইডেনটিটি পলিটিক্স মানে জাতপাতের রাজনীতি বিষয়ে কিছু চিন্তভাবনা করা। এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের স্বাভাবিক কারণেই বেশ কিছু দ্বিধা আছে। কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন আইডেনটিটি পলিটিক্সকে একেবারে অগ্রাহ্য করার ফলে অনেক জায়গাতেই মূল স্রোতের রাজনীতি, যেখানে একসময়ে বামপন্থীদের ভালোরকম শক্তি ছিল, সেখানে বড় ধরণের বিপর্যয় হয়েছে। যেমন বিহার বা উত্তরপ্রদেশ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন দলিত আন্দোলন একটা বড় পরিসর। দলিতদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী আছে এবং অনেক সময়েই তাদের মধ্যে একটা বিবাদমান সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই বিবাদকে পেরিয়ে দলিত ঐক্যর জন্য যে মতাদর্শগত বিষয়টি আবশ্যক তা বামপন্থীদেরই সবচেয়ে ভালো আছে এবং কাঁসিরাম বা মায়াবতীদের সীমাবদ্ধতাকে বামপন্থীরা এক্ষেত্রে পেরিয়ে যেতেই পারেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে আইডেনটিটি রাজনীতির যে নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে তা স্বীকার করেও এর আঙ্গিনার একেবারে বাইরে থেকে যাওয়াটা বামপন্থীদের কাজের কাজ হবে না বলেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বাম বিকল্পের প্রশ্নে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন মতাদর্শে দৃঢ় থাকাই কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল আর সেখানেই সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। সংগঠন বাড়ানোর তাগিদে অনেক সময়েই মতাদর্শের প্রশ্নে অনেক আপোষ করা হয়েছে আর তা একেবারেই ভালো ফল দেয়নি। মতাদর্শগত বিচ্যুতি ক্ষমতা হারানোর কারণ হয়েছে আর ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর এ রাজ্যে সি পি আই বা সি পি এমের সাংগঠনিক শক্তিও ভীষণভাবেই হ্রাস পেয়েছে।

রাজ্যের বর্তমান শাসন সম্পর্কে কিছু কথা প্রসঙ্গক্রমে আসে এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার এখন ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত। পুলিশ-প্রশাসন একেবারেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন না। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা ভুলে যাচ্ছেন তাদের দায়বদ্ধতা সংবিধানের প্রতি, কোনও দলের নেতানেত্রীদের কাছে নয়। এই প্রশ্নে বরাবরই বুদ্ধিজীবী বিদ্বজ্জনদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আশা করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গে দুঃখজনকভাবে তাদের গরিষ্ঠ অংশের বশংবদ মানসিকতা বেশি করে সামনে আসছে। নাগরিক অধিকারকে কেন্দ্র করে পার্টি এবং তার বাইরের মানুষের সোচ্চার হওয়ার ভালোরকম প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ আছে।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে ভোটের আগে মূলত বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যের কথা বেশি করে তোলা হয়। কিন্তু এই ঐক্যের নামে যে সব শক্তির সঙ্গে ঐক্যের চেষ্টা করা হয় তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বেশ সংশয়ের এবং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া অনেক সময়েই বামেদের বিড়ম্বনায় ফেলে। শোভনলালবাবু বাম ঐক্যের দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট মতামত হাজির করেন। বাম ঐক্যের একটি ভাবনায় যেভাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ঐক্যের কথা, যেমন সি পি আই-সি পি এমের ঐক্য, মাঝে মাঝে ওঠে তাকে খুব বেশি সম্ভাবনাময় বলে অন্তত বর্তমান অবস্থায় তিনি মনে করেন না। এক্ষেত্রে ইউরোপে বা বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায় যে মডেলটি এখন অনুসৃত হচ্ছে, তাকে তিনি বিচার্য বলে মনে করেন। লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন ধরণের বাম ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দেশে দেশে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে তারা একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছেন। এবং এই পদ্ধতির সাফল্যও এসেছে। বিভিন্ন দেশে বাম নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। অথচ এই সমস্ত দেশগুলোতে আশির দশক অবধি মূলত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বা সেনা শাসন চালু ছিল। ইউরোপেও কোনও কোনও জায়গায় এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গ্রীসের সিরিজার কথা এখানে অনেকেই জানেন, অন্যত্রও এই ধরণের পরীক্ষা চলছে এবং তারা ইউরোপীয় পার্লামেন্টেও প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এই ধরণের প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার জন্যও বটে আবার কমিউনিস্ট পার্টিকে জীবন্ত রাখার জন্যও সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন মতের সহাবস্থানের সুযোগ রাখা দরকার। মার্কসবাদের মধ্যেও বহুত্ববাদের একটা জায়গা আছে বলে শোভনলালবাবু মনে করেন। মার্কস ১৮৪৮-এ ম্যানিফেস্টো রচনার সময়ে যেভাবে ভেবেছিলেন, পরবর্তীকালে অনেক সময়েই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার থেকে ভাবনায় বদল এনেছেন। লেট মার্কস-এর লেখালেখি হিসেবে যা পরিচিত তার কথা আমরা এক্ষেত্রে মনে করতে পারি। এই বহুত্ববাদের পরিসর কমিউনিস্টদের মধ্যে থাকলে প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজটা অনেকটা এগোতে পারে।

'লেফট কালেকটিভ' আয়োজিত মহাবোধি সোসাইটির এই আলোচনাসভাটি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সাধারণীকৃত করা বা সবাইকে এক ব্র্যাকেটে রাখাটা কতটা ঠিক হতে পারে? বিশেষ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে তিনটি প্রশ্নের ওপর বিশেষ জোর দিলেন, সেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ, আইডেনটিটি পলিটিকসের রাজনৈতিক পরিসরে হস্তক্ষেপ এবং আদর্শ নির্ভর রাজনীতির জায়গাগুলোকে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন কয়েক দশক ধরেই তাদের চিন্তা ও অনুশীলনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে সি পি আই বা সি পি এমের সঙ্গে লিবারেশনের স্পষ্ট পার্থক্যের দিকটি আলোচনায় আসেনি। আবার শোভনলালবাবু সি পি এমের দলিল উদ্ধৃত করে সেখানে যেভাবে উত্তর আধুনিকতাকে প্রায় শত্রু শিবিরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার সমালোচনা করেন ও তাকে না মানলেও জানা বোঝার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করেন, সেখানেও লিবারেশনের ব্যতিক্রমী উদাহরণ তাঁর মনে পড়েনি। অথচ লিবারেশনের কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলে এবং বিভিন্ন পরিসরে গুরুত্ব দিয়েই এই সমস্ত প্রসঙ্গে অধ্যয়ন চালানো হয়েছিল। আবার শোভনলালবাবু বিভিন্ন আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলের সঙ্গে বামেদের জোটের মধ্যে যে সব সমস্যা ও বিড়ম্বনা দেখেছেন সে সম্পর্কে লিবারেশন ধারাবাহিকভাবেই সোচ্চার থেকেছে এবং মনে করেছে কখনও লালু বা নীতীশ কখনো মায়াবতী বা মুলায়ম আবার কখনো জয়ললিতা বা নবীন পট্টনায়কদের কাছে আত্মসমর্পণ বাম রাজনীতির পক্ষে আত্মঘাতী হবে। এর বিপ্রতীপে লেফট কনফেডারেশন তৈরির চেষ্টাকে লিবারেশন সব সময়েই অগ্রাধিকার দিয়েছে। শোভনলালবাবু সন্দেহজনক চরিত্রের বুর্জোয়াদের সঙ্গে বামেদের জোট নিয়ে বিড়ম্বনার কথা তুলেছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতর থেকে এ বিষয়ে যে ধারাবাহিক ও সোচ্চার প্রতিক্রিয়া এসেছে, তাকে সামনে আনেননি।

প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এদেশের তাত্ত্বিক মার্কসবাদের চর্চাকারীরা (?) কমিউনিস্ট বা বাম আন্দোলনের ভেতরের মার্কসবাদের চর্চার সঙ্গে কেন কোনো সূত্রে সেভাবে নিজেদের যুক্ত করেন না, সেটা করলে তো চর্চা ও যে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় এই চর্চা তা অনেক শক্তিশালী হতে পারত। এই প্রশ্নের উত্তর আসেনি, তবে আশা করা যাক এদেশের তাত্ত্বিক মার্কসবাদের চর্চাকারীরা আগামীদিনে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ভাববেন ও ফলিত মার্কসবাদী চর্চার সঙ্গে একটি সজীব বিনিময়ের সম্বন্ধ গড়ে তুলবেন।

- সৌভিক ঘোষাল

সংগঠকের ডায়েরী

সে দিন ছিল বুধবার, ২৩ জুলাই, ২০১৪। রাত দশটা কুড়ি বাজে। পার্টির জেলা কমিটির মিটিং সেরে ট্রেন থেকে চাঁদপাড়া স্টেশনে নেমেছি। প্লাটফর্মে একজন যুবকের সাথে কথা বলে বাড়ি ফিরছিলাম। অন্ধকারে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে রেলের মাঠে আসতেই একজন প্রতিবেশীর ফোন পেলাম। তিনি বললেন, রাস্তার দাবিতে গণ দরখাস্তগুলো বিডিও, বি এল আর ও, এ ডি এম (এল আর) সকলকে দিয়ে এসেছেন। তারপর বললেন বহু যুবক রাস্তায় ভিড় করে আছে, ঝামেলা চলছে, আপনি আসুন। বুঝে নিলাম একটা কিছু হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পার্টি অফিসের কাছে এসে দেখলাম রাস্তায় শ-তিনেক মানুষের ভিড়, উত্তেজিত যুবকদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—রাস্তা আটকে পাচিল দেওয়া চলবে না। সহজেই বুঝে নিলাম আওয়াজটা রাস্তার পক্ষে। সাহস বাড়ল। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে জনতার দাবি বুঝে চলে গেছে। এগিয়ে গেলাম ঘটনার আসল জায়গা—রাস্তার মাঝে। সেখানে মাটি খুঁড়ে পাকা পাচিল তোলার জন্য কংক্রিটের কাজ করা হয়েছে। জোরের সাথে জানতে চাইলাম, এটা কে করেছে? কারা মদত দিয়েছে? উত্তর এল, দুপুরে পঞ্চায়েত রাস্তা তৈরীর সময় জোর করে একাজ করা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। এখনই এসব উপড়ে ফেলতে হবে! বলার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবকেরা মাটির নীচ থেকে কংক্রীটের রড সহ সমস্ত মালমশলা নিমেষের মধ্যে তুলে ফেলতে লাগল। মহিলা, যুবক, বয়স্ক মানুষ উৎসাহিত হয়ে উঠল। একজন যুবক কংক্রীট ভাঙ্গার বিরোধিতা করতেই রে রে করে সবাই তার দিকে ধেয়ে গেল। উত্তেজনার পারদ আরও চড়ে গেল। রাস্তার জন্য ইঁট-সুরকি দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছিল। মুহূর্তের মধ্যে মহিলারা ইঁট-সুরকি বয়ে রাস্তার কাদাজল, গর্ত ভরাট করতে শুরু করল। যুবক, বৃদ্ধরা সামিল হয়ে গেল। কাজের সাথে সাথে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিল—শিশুদের কাদাজলে পড়ে যাওয়া, মহিলাদের জুতো হাতে কাপড় গুটিয়ে পার হওয়া, মোটর সাইকেল থেকে পড়ে পা ভাঙ্গা, শিশুদের স্কুলগাড়ি উল্টে যাওয়ার বিপদ, সাইকেল আরোহীকে নেমে যেতে বাধ্য হওয়া—এরকম অসংখ্য সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছিল। এই সব ক্ষোভ একসাথে আছড়ে পড়ে পঞ্চায়েতের দীর্ঘদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, আর গোপন পরিকল্পনাকে চাপা দিয়ে ৭০ বছর ধরে ব্যবহৃত ১৬৬ ও ১৭০ নং বুথের রাস্তার বাধাকে অতিক্রম করে নতুন রূপে নিরাপদে সকলের চলার রাস্তা করে দিয়ে জন্ম দিল এক নতুন চেতনার। ঐক্যবদ্ধ হলে মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অধিকার ফিরিয়ে আনা যায়। এখানে দলের রং লাগে না, ''জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ'' হয়ে যায় যদি রাস্তায় নেমে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া যায়। রাত তখন ১টা, আগামী দিনের সকালের দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মানুষ বাড়ি ফিরতে শুরু করল।

- কৃষ্ণ প্রামাণিক

সারা ভারত

কিষাণ মহাসভার ডাকে

৯ আগস্ট

দেশজুড়ে জেলায় জেলায়

বিক্ষোভ

- কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ বন্ধ কর।
- অধিগ্রহণের জমির ক্ষতিপূরণের মাত্রা কমানো বন্ধ কর।
- জি এম বীজ ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা কর।

এ ভাঙ্গন কেমন ভাঙ্গন

সি পি এম এবার সবচেয়ে বড় ভাঙ্গনে পড়ল পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। দল ছাড়লেন হলদিয়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তমালিকা পণ্ডা শেঠ, সঙ্গে এক ঝাঁক জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও জেলা কমিটির সদস্য এবং আরও কিছু সদস্য, হাজার দুয়েকের কিছু বেশী। ভাঙ্গনে আপাতদৃষ্টিতে নেত্রীত্বের নজর কাড়লেন তমালিকা, কিন্তু নেপথ্যে নিঃসন্দেহে অপারেশানে নেতৃত্বের শক্তিশেল হেনেছেন লক্ষ্মণ শেঠ, দলের একদা হলদিয়া 'সম্রাট', প্রাক্তন সাংসদ এবং মাস চারেক আগে বহিষ্কৃত। দল ছেড়ে দেওয়া জেলা নেতারা সবাই কট্টর লক্ষ্মণ অনুগামী এবং নন্দীগ্রাম-কুখ্যাত। দলের নন্দীগ্রাম কুখ্যাতির শরিক। দলকে উৎপাটিত হতে হয়েছে সর্বোপরি রাজ্য শাসনের ক্ষমতা থেকে, উৎখাত হতে হয়েছে রাজ্যজুড়ে আরও অনেক ক্ষমতা থেকে, এখনও উচ্ছেদ হচ্ছে। লক্ষ্মণ-তমালিকা গোষ্ঠীকেও তাদের ক্ষমতাগুলো থেকে পতিত হতে হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ ভাঙ্গনের মধ্যে।

এই ভাঙ্গনকে কীভাবে দেখব? এই ভাঙ্গনের সাথে বামপন্থার যোগবিয়োগের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে? এখান থেকে বামপন্থার কোনও শিক্ষা নেওয়ার আছে? প্রশ্নগুলো হয়ত অলক্ষ্যে তাড়িত করতে পারে। তাই একটু চেরাই করে দেখা যেতেই পারে।

প্রথমে তাদের কথায় আসা যাক যে গোষ্ঠী সি পি এম ছাড়লেন। কি ছিল তাঁদের দল ছাড়ার প্রক্রিয়া? তাদের ঘোষণায় এখনও পথ-কর্মসূচী-রণনীতি-রণকৌশল-জোট সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে মতপার্থক্যের বার্তা নেই। দল ছাড়ার মূল মূল কারণ তারা নিজেরাই বলেছেন, রাজ্য নেতৃত্বের উদ্ধত, আমলাতান্ত্রিক এবং স্বজনপোষণ-গোষ্ঠীবাজী চালানোর কালচার। রাজ্য নেতৃত্ব নন্দীগ্রাম-খেজুরিতে আক্রান্ত পার্টি কর্মীদের পাশে দাঁড়ায়নি, মামলার খরচ যোগায়নি, হলদিয়ায় আক্রান্ত বাম পুর প্রতিনিধিদের পাশে থাকেনি। তমালিকা বলেছেন, দল ছাড়তে চাননি, ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। লক্ষ্মণের প্রতিক্রিয়া—স্তাবকদের দিয়ে পার্টি চলছে, নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে রাজ্য নেতারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কে অসৎ।

চার মাস আগে যখন লক্ষ্মণ পার্টি সদস্যপদ নবীকরণ করেননি, অথবা দল তাকে বহিষ্কৃত করে, তখন তার গোষ্ঠী দলের মধ্যেই ছিল, তমালিকাও দলের বিরুদ্ধে যাননি। এখন বোঝাই যাচ্ছে লক্ষ্মণ-তমালিকা গোষ্ঠী আরও কিছু সময় নিয়েছিল আভ্যন্তরীণ সংঘাত ফয়সালা করার। সি পি এম রাজ্য নেতৃত্বও কিছু সময় নিচ্ছিল পরিস্থিতি মোকাবিলার। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল বিষয়টাই হল, নন্দীগ্রামকাণ্ডের দায় বহন করবে কোন্ পক্ষ? কর্পোরেট জমি গ্রাসের জন্য আগ্রাসী হওয়া, তার জন্য অকথ্য দমন-পীড়ন নামানো, দু-দুবার গণহত্যা সংঘটিত করা, আর এসবের জেরে কৃষক প্রতিরোধ—কৃষক বিদ্রোহের সম্মুখীন হওয়া, এমনকি বামফ্রন্ট শাসন ও সি পি এমের প্রতাপ চুরমার হয়ে যাওয়া—এই সবকিছুর জন্য দায়ি কারা? এই বিরোধ-বিতর্ক নিষ্পত্তির প্রশ্নে সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব এবং লক্ষ্মণ-তমালিকা গোষ্ঠীর অবস্থান চরম সুবিধাবাদী। প্রকৃত ঘটনা ও প্রবণতা হল, উভয়পক্ষই দায়ী, অথচ এক পক্ষ যত দোষ চাপাতে চাইছে কেবল অন্যপক্ষের ওপর। ২০১১-র পতনের পর থেকে সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব বারবার সাফাই গেয়ে আসছেন, দল নন্দীগ্রামকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়েছে। শুদ্ধিকরণ করেছে। কিন্তু কোথায় করেছে, কোথায় কীভাবে তা নথিভুক্ত হয়েছে, কোনও তথ্যপ্রমাণ হাজির করা নেই। রাজ্য নেতৃত্ব থেকে লক্ষ্মণকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা-প্রতারণা-অপরাধের বিচারের প্রশ্নকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিক্রিয়ায় ভাঙ্গনে যা হওয়ার সেটা অনিবার্যই ছিল। তবু সি পি এম নেতৃত্বের দম্ভের শেষ নেই। দলের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাকে আড়াল দিতে কথা শোনাচ্ছেন। কি শোনাচ্ছেন! এই ভাঙ্গনে তাদের কিছু এসে যায় না, কারণ এই জেলায় তাদের সদস্য সংখ্যা এখনও ১৭ হাজার, লোকসভা ভোটেও দলের ভোট বেড়েছে। চমৎকার! ভাঙ্গনের গভীরে রয়েছে যে মারাত্মক সংক্রমণ, কঠিন ব্যাধি, সেই সবকিছুকে তাচ্ছিল্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা আজও চালানো হচ্ছে।

অপরাধী মুখ বাঁচাতে, অপরাধের বিচার থেকে রেহাই পেতে লক্ষ্মণ শেঠ কম ধান্দার বান্দা নন। তিনি তৃণমূলনেত্রীর 'বাস্তববাদী পরিবর্তন' নিয়ে আসার তারিফও করেছেন। লক্ষ্মণ-তমালিকার দল বলছেন, তারা রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিচ্ছেন না। আগামীদিনে তাঁদের লক্ষ্য 'ভারত নির্মাণ মঞ্চ' গঠন। সামনে তারই কনভেনশন। তবে ঐ লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্যটা কি? সেটা টি এম সি, বিজেপি, কংগ্রেস সাপেক্ষে শেঠগোষ্ঠী এখনও ঝেড়ে কাশছে না।

এটা একটা নেতিবাচক ভাঙ্গন। লক্ষ্মণ-তমালিকা শেঠ ও তাদের জেলা নেতারা কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার যোগ্য নন। যেহেতু বিশেষত তাদের নন্দীগ্রামকাণ্ডের ভূমিকা নিয়ে তারা আজও অনুতাপবিহীন। আর, এদের দল থেকে বিদেয় হওয়া দেখিয়ে সি পি এম নেতৃত্বেরও হাত ধুয়ে ফেলার সুযোগ নেই। উপায় নেই এটা দাবি করার যে দল খুব সাধু-শুদ্ধ-নীতিনিষ্ঠ হচ্ছে। কারণ সি পি এম নীতিদূষণ-নীতিপঙ্গুত্ব থেকে নিজের বেরিয়ে আসার কোনো সদিচ্ছা আজও দেখাচ্ছে না।

এই উভয় নেতির প্রভাবে যে সাধারণ বাম সারির শক্তিগুলো রয়েছে তারা এই নেতিবাচক ভাঙ্গন থেকে পারলে কিছু শিক্ষা নিতে পারেন। সরকার থেকে শুরু করে আধা-সরকারি যাবতীয় সব প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাসবর্স্বতার মতাদর্শ ও রাজনীতি, দমন-পীড়নের নীতি ও জনস্বার্থবিরোধী নয়া উদারনীতি, দলের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্র ও স্বাস্থ্যকর বিতর্ক প্রসঙ্গে চরম অসহিষ্ণুতা এবং চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক কালচার—এই গাড্ডার সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর পথ খোঁজা প্রয়োজন। ধ্রুবতারা হোক সংগ্রামী বামপন্থা।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

... সজাগ থাকুন

একের পাতার পর

আসলে সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু করেছে ও তাকে আইনের অধীনে এনেছে কোন ধরণের সদাশয় মনোভাব থেকে নয়, তা হয়েছে গ্রামীণ গরিব জনগণের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের চাপেই। আইনকে রূপায়িত করতে তাদের তীব্র অনীহা। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের দরুন গ্রামীণ ধনী ও ভূস্বামীদের পক্ষে মজুরদের ওপর যথেচ্ছাচার চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। তারা মজুর পাচ্ছে না বা পেলেও ইচ্ছেমত মজুরিকে কমাতেও পারছে না। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প তুলে দেওয়ার জন্য তাদেরও চাপ আছে, কর্পোরেটদের চাপ তো আছেই। তাই আইনকে কার্যকরি করার প্রশ্নেও গরিব জনগণকে প্রতি পদেই আন্দোলনে নামতে হয়েছে ও হচ্ছে। এর জন্য অনেক রক্তক্ষয়ও ঘটেছে। এখন এই নতুন পরিকল্পনায় সরকারের উদ্দেশ্য হল ধাপে ধাপে এই প্রকল্পকে গুটিয়ে দেওয়া। তাই তাদের আগে প্রয়োজন আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে এই প্রকল্পকে মুক্ত করা।

ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের, গ্রামের গরিবদের লড়াই করেই নিজেদের দাবি অর্জন করতে হয়, নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হয়। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে গুটিয়ে আনার মধ্য দিয়ে সরকার আরও বড় ধরণের চক্রান্ত করছে। এই চক্রান্তর বিরুদ্ধে গ্রামের গরিব জনগণকে এখন থেকেই সজাগ থাকতে হবে।

- কল্যাণ গোস্বামী

কমরেড তৃপ্তিদাকে মনে রেখে ...

একের পাতার পর

এবং ওয়ারেন্ট বেরিয়ে যাওয়া—শেষ পর্যন্ত কলেজ/হস্টেল ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া তথা অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে বরণ করার স্পর্ধা দেখানো।

... পরবর্তী অধ্যায়। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে আপাত শান্ত। ইতিমধ্যে ঠক্কর খেতে খেতে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তৃপ্তিদা পৌঁছে গেছেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার পার্টির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রয়াত কমরেড শংকর দাস এবং বর্তমানে আমাদের পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তীর সাথে সেই সময় তার জীবন্ত সম্পর্ক ছিল। চটজলদি হোলটাইমার হওয়ার পরিবর্তে তিনি দীর্ঘকালীন দৃঢ় সমর্থক তথা পার্টটাইমার রূপে কাজ করার পথ গ্রহণ করেন। জলপাইগুড়ি ফার্মাকোলোজী কলেজে ভর্তি হন। একটা ডিগ্রী পাওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ পড়াশুনা, কলেজের নতুন বন্ধুদের সাথে জমিয়ে আড্ডা এবং সাধ্যমত পার্টির বিভিন্ন কাজকর্মে সামিল হওয়া—এই প্যাটার্ণের মধ্যে এগিয়ে চলল তৃপ্তিদার দ্বিতীয় ইনিংস। দেখতে দেখতে বছর পেরোতে লাগল এবং ফার্মাসিস্ট ডিপ্লোমাও হাসিল করে ফেলেন তৃপ্তিদা।

ততদিন আমাদের পার্টি ও আন্দোলনের ধাক্কা এক ব্যাপক রূপ নিয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতা, মতাদর্শগত বিভ্রান্তি ও বিভাজনের শিকার হয়েছে। এই অবস্থায় একটা চাকরির সন্ধানে লেগে যান তৃপ্তিদা। একটি-দুটি অস্থায়ী চাকরি করার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪-৭৬ পর্যায়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হেলথ স্কীম (সি জি এইচ এস)-এর এক স্থায়ী সরকারি চাকরি নিশ্চিত হয়। কয়েক বছর চাকরি করতে করতে তৃপ্তিদা অনুভব করেন যে সি জি এইচ এস কর্মচারীদের একটা ইউনিয়ন বা সমিতি গড়ে তোলাটা নেহাতই জরুরী। লেগে যান সেই কাজে। কাজটা খুব সহজ ছিল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশব্যাপী সি জি এইচ এস ইউনিটগুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা—কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রয়াসকে গুটিয়ে এনে একটি ইউনিয়নে রূপ দেওয়া। কিন্তু এই জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তুলেছিলেন তৃপ্তিদা এবং এই প্রক্রিয়ায় গড়ে তুলেছিলেন দেশের বিভিন্ন কোণায় এক ঝাঁক কর্মী বাহিনী, যাদের মধ্যে দিল্লীর কমরেড রামকিষাণজীর মত নেতা উল্লেখযোগ্য। ইউনিয়ন তথা সমিতি গঠনের পর আন্দোলন ও বিভিন্ন দাবিপূরণ করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ''স্বীকৃতি'' আদায় করা এবং সেই অধিকারকে ব্যবহার করে আরও বৃহৎ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়া—এইভাবেই সি জি এইচ এস কর্মী সংগঠন এগোতে থাকে। তুলনামূলকভাবে ছোট ইউনিট হয়েও এই সংগঠন আন্দোলন ও রাজনৈতিক দিশার নিরীখে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

ইতিমধ্যে তৃপ্তিদার সাথে পার্টির সম্পর্ক পুনরায় গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মচারী আন্দোলন তথা কর্মী সংগঠনের গতিবিধির ক্ষেত্রে পার্টির গাইড লাইনকে রূপায়িত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। নিদেনপক্ষে স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে পার্টির প্রভাব তথা সাংগঠনিক বিস্তার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছুটা মাত্রায় হলেও করা গেছে। আমাদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এ আই সি সি টি ইউ-র সাথে সি জি এইচ এস কর্মী সংগঠনের এক স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কর্মী সংগঠনের মধ্যে মহিলা শাখা নির্মাণ ও তাকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আমাদের মহিলা সংগঠন আইপোয়ার সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে স্বাস্থ্য কর্মী আন্দোলন তথা সংগঠনের গতিবিধির মধ্যে এইসব নতুন মাত্রা যুক্ত করার ক্ষেত্রে তৃপ্তিদার অনন্য ভূমিকা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত একটি কর্মী সংগঠনের বড় মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তৃপ্তিদা তার রাজনৈতিক পরিচিতি ঘোষণা করতে কখনও দ্বিধা করতেন না বরং পার্টির সাথে কিংবা পার্টি পরিচালিত বহুমুখী গতিবিধির সাথে স্বাস্থ্য কর্মী সংগঠন ও আন্দোলনকে কিভাবে জড়িয়ে ফেলা যায় তার জন্য সৃজনশীল প্রচেষ্টা ছিল তার বিশেষ গুণ।

সি জি এইচ এস কর্মী সংগঠনকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য কর্মীদের ফেডারেশন তথা কনফেডারেশন গড়ে তোলাও ছিল এক বিশেষ উদ্যোগ যা এই সেক্টরে বিস্তার করার ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।

২০০৬ সালে তৃপ্তিদা অবসর গ্রহণ করেন। হঠাৎ তিনি প্রস্তাব দেন যে এরপর তিনি পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলায় গিয়ে পার্টির সাধারণ কাঠামোর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে চান। প্রাথমিকভাবে আমি এই প্রস্তাবকে নিরুৎসাহিত করি। আমার মূল যুক্তি ছিল ঃ দীর্ঘসময় একটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করে যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তৃপ্তিদা তাকে এখন আমাদের দিশায় সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কাজে পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য পরে আমি সক্রিয় বিরোধিতা থেকে সরে আসি। তথাপি একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল যে তৃপ্তিদার মুর্শিদাবাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি মূলত আবেগপ্রবণ এবং বাস্তবে তা রূপায়িত করতে উনি হয়ত পারবেন না। অবশ্য তৃপ্তিদা অবসরের পর তার প্রস্তাবটি কার্যকরি করেন এবং প্রায় ৫/৬ বছর মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক হিসাবেও কাজ পরিচালনা করেন। সেখানকার কাজের নিরীখে তৃপ্তিদা কতটা সফল হয়েছেন সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু অবসর নেওয়ার পর পার্টির মুখ্য ধারায় গিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পেছনে যে বিপ্লবী আবেগ নিহিত ছিল তা অবশ্যই ব্যতিক্রমী ও শিক্ষণীয়। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মানসিকভাবে আরও শিথিল হয়ে পড়া বা নিরাপদ অবস্থানে চলে যাওয়ার প্রবণতারই আমরা বেশী বেশী করে সম্মুখীন হই।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক দপ্তরের ইনচার্জ হওয়া সুবাদে কমরেড তৃপ্তিদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। খুবই প্রাণবন্ত মানুষ; মানুষের সঙ্গে খুব সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। আর ছিল প্রবল রসবোধ। কোন দায়িত্ব বা কাজকে বোঝা হিসাবে না দেখে তাকে ''উপভোগ'' করতে জানতেন। মনে পড়ছে, কলকাতায় ৮ম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে মহাজাতি সদন আনা নেওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থার দায়িত্ব খুবই সফলতার সঙ্গে পালন করেছিলেন তৃপ্তিদা। যদিও এই ধরণের কাজ করতে তিনি আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না।

কমরেড তৃপ্তিদা হয়ত আরও কিছুদিন বিপ্লবী সংগ্রামের সেবায় নিজেকে উজাড় করতে পারতেন কিন্তু ক্যান্সার রোগের আক্রমণ তাকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিল। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তার বর্ণময় জীবন ও কর্মের এক দীর্ঘ পরম্পরা। আসুন, সেই পরম্পরাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের উপস্থিতিকে সব দিক থেকে আরও জোরালো করে তুলি।

- ডি পি বক্সী

সংগ্রাম দেশে দেশে

দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের সংগ্রামে বিজয়

দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রেণী সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। জুন মাসের শেষে প্ল্যাটিনাম খনি শ্রমিকদের পাঁচ মাসব্যাপী চলা ধর্মঘট বিজয়ের মুখ দেখল। মালিক এবং ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের অনেক দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হল। এই বিজয় প্ল্যাটিনাম সেক্টরের খনি শ্রমিক বা তাদের ইউনিয়ন এ এম সি ইউ-র শুধুমাত্র নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য বিজয়ের সূচনা। পাঁচ মাস ধরে চলা এই লড়াই-ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল ৮০,০০০ খনি শ্রমিক, যারা ম্যানেজমেন্টের মাত্র ৯ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্ল্যাটিনাম সেক্টর দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বড় বড় সংস্থার মালিকেরা প্ল্যাটিনাম উৎপাদন এবং বাইরের দেশে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। বলাই বাহুল্য এই মুনাফার সিংহভাগই আসে খনি শ্রমিকদের শোষণ এবং বেতন চুরির মধ্যে দিয়ে। খনি থেকে প্ল্যাটিনাম তোলার কাজটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। একদিকে কষ্টসাধ্য কাজ, কাজের পরিবেশ এবং ভীষণ কম মজুরি, আর এর উল্টোদিকে থাকে মালিক-ম্যানেজমেন্টের বিপুল মুনাফা অর্জন এবং চোখরাঙানি—এই সামাজিক বৈষম্য এবং বৈপরীত্যমূলক আচরণ বিদ্রোহের বীজ রোপণ করেছিল জোহানেসবার্গেই শুধু নয়; বরং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করা যাক। শ্বেতাঙ্গ শাসন এবং বর্ণভিত্তিক শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৬০ সালে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যখন স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনামের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনামের সন্ধানে একদিকে যেমন বিদেশী পুঁজির—ব্রিটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে, তেমনি অন্যান্য দেশ থেকে শ্রমিকরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসে কাজের সন্ধানে। শ্রম এবং পুঁজির স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব হিসাবেই খনি শিল্পে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভও শুরু হয়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, কৃষকদের জমি দখলের সংগ্রাম ও খনি অঞ্চলে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক প্রতিনিধি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের (এ এন সি) এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির (এস এ সি পি)। শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে এ এন সি-র অবস্থান পুঁজি বিরোধিতার প্রশ্নে ছিল বরাবরই আপোষকামী। কিন্তু তার জঙ্গী অংশ বা বামপন্থী অংশ সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গণআন্দোলন এবং সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা হিসাবে নেলসন ম্যাণ্ডেলার মত ব্যক্তিত্ব অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করেন, যিনি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে বন্দী ছিলেন। দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৯৪ সালে শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটে এবং নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিভূ হিসাবে এ এন সি সরকার গঠন করে এবং এ এন সি-র সাথে জোটে শরিক হয় দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের প্রভাবাধীন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কোসাটু, যাদের ভূমিকা দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিনব্যাপী চলা মুক্তি সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের হাতে নিহত হয় বহু শ্রমিক-কৃষক, এ এন সি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব—যেমন ফ্রিস হানি। বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হলেও এ এন সি তার শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে পুঁজির সার্বিক বিরোধিতা কখনই করেনি এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যাণ্ডেলা এবং কমিউনিস্ট পার্টি, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন—ব্যাঙ্ক এবং খনিগুলোর জাতীয়করণ ও উৎপাদনের উপর শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের মত দাবিগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়নি।

ক্ষমতায় আসার পর প্রথম কয়েক বছর এ এন সি তাদের প্রতিশ্রুতির কিছু কিছু পালন করার চেষ্টা করে, যেমন নতুন ৫ লাখ ঘর তৈরি, জল এবং বিদ্যুৎ ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু বেকারত্বের কোন উন্নতি হয়নি। এর বিপরীতে নেলসন ম্যাণ্ডেলার নেতৃত্বাধীন সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সংস্কারকেই কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কোসাটুর বামপন্থী অংশ এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেও এবং সমাজতন্ত্রই মুক্তি এই কথা ঘোষণা করলেও এ এন সি-র সাথে জোটে থাকার ফলে সর্বাত্মক লড়াইয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথম পাঁচ বছরের কিছু কিছু সংস্কারের কারণে ১৯৯৯ সালে এ এন সি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয় এবং পুঁজির স্বাভাবিক নিয়মে তাদের নীতি সংস্কারবাদী থেকে সরাসরি পুঁজিবাদী নীতিতে পর্যবসিত হয়। ১৯৯৪ যা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ এবং বামপন্থীদের কাছে এক সাড়া জাগানো ঘটনা ছিল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটালেও ধীরে ধীরে এক কৃষ্ণাঙ্গ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম দেয়। এ এন সি এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ক্ষমতাকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিক-কৃষকের উপর সরাসরি আক্রমণ শুরু হয়। এ এন সি-র সরকার পুঁজিপতিদেরই সমর্থন করে আর কমিউনিস্ট পার্টি ও তার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, বিশেষত দক্ষিণপন্থী অংশ এতে সমর্থন দেয়। শুধুমাত্র খনি শ্রমিকরাই নয়, ২০১০ সালে সরকারি সংস্থার শ্রমিকরাও বেসরকারিকরণ, কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল সামল হয়। খনি অঞ্চলের শ্রমিক শোষণ এবং তার কাজের পরিবেশ সর্বজনবিদিত। বিদেশী হাঙ্গরদের সাথে এই শোষণে যোগ দেয় নব্য কৃষ্ণাঙ্গ বুর্জোয়ারাও। এ এন সি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুব সংগঠনের মধ্যে থেকেও খনি জাতীয়করণ বিষয়টি আলোচনা হতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকদের উপর আক্রমণের সময় সরকার খনি মালিকদেরই পক্ষ নেয়। ২০১১ সালে জুলাই মাসে ধাতু শ্রমিক ও অন্যান্য শিল্প সংস্থার শ্রমিকরা সরকার ও মালিক প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখ্যান করে আরও বেশী মজুরির দাবিতে লড়াই চালাতে থাকে যা অংশত জয়যুক্ত হয় ২০১২ সালে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে ১৯৯৪ সালে 'স্বাধীনতা' এবং 'গণতন্ত্র' অর্জিত হওয়ার পরে বর্বরতম ঘটনা ঘটে যখন এ এন সি সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে ৩৪ জন আন্দোলনরত শ্রমিককে হত্যা করেছিল। ঘটনাস্থল ছিল মারিকানা, যেখানে শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে লড়াই চালাচ্ছিল। এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ১৯৬০ সালের ঘটনাকে, যখন বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার গুলি চালিয়ে ৬০ জন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিককে হত্যা করেছিল। মারিকানার ঘটনা একদিকে যেমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে বর্ণবিদ্বেষী শাসন থেকে মুক্তি সত্ত্বেও দুর্বিষহ অবস্থা থেকে আজও শ্রমিক-কৃষক মুক্ত নয়, অন্যদিকে এ এন সি-র ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণী সমঝোতার রাজনীতি এখনও কায়েম থাকছে। ৩৪ জন শ্রমিকের নিষ্ঠুর হত্যার পরেও খনি সংস্থার সি ই ও এক শান্তিসভার আয়োজন করে, যার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে 'শান্তি চুক্তি'র চেষ্টা এবং এতে সামিল হয়েছিল এন ইউ এম—যারা কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কোসাটুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে আশার কথা হল, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকশ্রেণী বিশেষত খনি শ্রমিকদের আত্মপ্রত্যয় তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এক সময়কার লড়াকু নেতৃত্বের পশ্চাদপসারণ ও বেইমানি দেখেও হতাশ না হওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে চলমান এই শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটে এ এন সি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক ঐতিহাসিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে 'নামসা' (এন ইউ এম এস এ) গঠন হয়, যা সারা দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কোসাটুর সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, নিজেকে এ এন সি সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এ এন সি সরকারের গৃহীত নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি এবং তাতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার ট্রেড ইউনিয়নের প্রকারান্তরে সমর্থন 'নামসা'র এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ। ৩ লাখ ৪০ হাজার সদস্যযুক্ত 'নামসা'র এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৪ সালের এপ্রিলে নির্বাচনী ফলাফলকে খুব বেশিমাত্রায় প্রভাবিত করতে না পারলেও, আগামীদিনের লড়াইয়ের জায়গাটাকে আরও মজবুত করেছে।

মারিকানায় পুলিশের গুলি চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা খনি শ্রমিকদের দমন করতে পারেনি। তার প্রমাণ হল পাঁচ মাসব্যাপী চলা ধর্মঘট যা বিজয়ের পথ দেখেছে। ধারাবাহিক লড়াই এবং ধর্মঘট শুধুমাত্র ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে নয়, বরং মালিকপক্ষের প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরির দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তা পুঁজিবাদী সমাজের মূল দ্বন্দ্বকে এবং দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছে—যা হল দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের হাত থেকে খনিগুলোকে কেড়ে নিয়ে জাতীয়করণ করা, যাতে দেশের খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করে আরও বেশী জীবিকা তৈরী করে দারিদ্রের অবসান ঘটানো যায় এবং এক কথায় সমাজের পুনর্গঠন করা যায়। এই ধর্মঘটে শেষের এক মাসের মধ্যেই 'নামসা'র নেতৃত্বে ২ লক্ষ ২০ হাজার ধাতু শ্রমিক ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছে এবং এ লড়াই এখনও অব্যাহত। ধর্মঘটকে ভাঙতে মালিকপক্ষের লক আউটের হুমকী এবং সরকারি মদতে পুলিশী নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আত্মপ্রত্যয় বুঝিয়ে দিচ্ছে ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকশ্রেণীর সুখনিদ্রার দিন চলে গেছে।

শ্রমিক আন্দোলনের জয় ও তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

দক্ষিণ আফ্রিকার ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনে আংশিক বিজয়লাভ এই মহাদেশে তো বটেই, ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার বিষয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মত ধারাবাহিক জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। যদিও গুরগাঁও, মানেসর, তামিলনাড়ুর প্রীকল কারখানায় ও অন্যান্য জায়গায় সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিকরা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শাসককুল নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি রূপায়ণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের শোষণ করছে নব্য ঔপনিবেশিক কায়দায়। ভারতীয় শাসকশ্রেণীও তার নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি চাপিয়ে একই বন্দোবস্ত কায়েম করতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এটা ঠিকই দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে বিপ্লবী উপাদান তুলনায় অনেক বেশি, যেখানে সাধারণ নির্বাচনে খনির জাতীয়করণ ও উৎপাদনের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের মত দাবিগুলো উঠেছে। কিন্তু এটা ভাবার কারণ নেই যে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী নয়া উদারনৈতিক আক্রমণগুলোকে মুখ বুজে মেনে নেবে।

মারুতি হুণ্ডা কারখানার শ্রমিকরা মালিক, ম্যানেজমেন্ট, গুণ্ডাদের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে ধারাবাহিক আন্দোলনের রাস্তায় নেমেছে। '৭৭-র রেল ধর্মঘটের পর আর সর্বাত্মক ধর্মঘট না হলেও, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকা সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যের মুখ দেখেছে। পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের এক বিশাল শ্রমিকশ্রেণী তৈরী হয়েছে, যা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যাখান করার ক্ষমতা রাখে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনের বন্ধ কারখানা খোলার দাবি, মর্যাদাসম্পন্ন ন্যূনতম মজুরির দাবিতে, যত্রতত্র ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ও ঠিকা শ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখানে নিশ্চয় আরও জোরদার হবে।

- সংগ্রাম সরকার

তথ্যসূত্র ঃ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.স্যোসিওলিস্টওয়ার্ল্ড.নেট/ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.মার্কসিস্ট.কম

বজবজ শাখায় নির্মাণ শ্রমিক সম্মেলন

২৭ জুলাই চড়িয়াল জয়চণ্ডীপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের বজবজ শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে এক সপ্তাহ যাবত ব্রাঞ্চ/পাড়া স্তরে বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়। তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের ৭০ শতাংশ ছিলেন মহিলা।

সম্মেলন শুরুর আগে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন নির্মাণ ইউনিয়নের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কিশোর সরকার। মাল্যদান করেন সি পি আই (এম এল)-এর জেলা কমিটি সদস্য দেবাশীষ মিত্র ও আশুতোষ মালিক, এ আই সি সি টি ইউ-র জেলা নেতা বিপ্লব দেবনাথ, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের বিদায়ী সভাপতি ইন্দ্রজিৎ দত্ত ও সম্পাদক কাজল দত্ত, কমিটি সদস্য অঞ্জনা মাল, দেবযানী গোস্বামী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী। সম্মেলনের মূল অধিবেশন শুরু হয়। প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং প্রতিবেদনের ওপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন, মতামত রাখেন। সম্মেলনকে বর্ণময় করে তোলে চলার পথে সংস্থার সাংস্কৃতিক পরিবেশন। সবশেষে ১৯ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ দত্ত ও কাজল দত্ত। আগামীতে সম্মেলনের মধ্যে বজবজ মহেশতলার ব্যাপক নির্মাণ শ্রমিকদের সামিল করা, সদস্য করা এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করা হয়।

হিন্দমোটরে ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

২৩ জুলাই সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের হিন্দমোটর-কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটি, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি সহ অন্যান্য গণসংগঠনগুলোর ডাকে উত্তরপাড়া থানার সামনে সকাল ৮টা থেকে সংগঠিত হয় এক গণবিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী। ২২ জুলাই পার্টির হুগলী জেলা কমিটির সদস্য এবং প্রগতিশীল মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালী সেন, স্বপন গুহ ও প্রদীপ সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শ্রীরামপুর মহকুমার এস ডি পি ও-র সাথে দেখা করে ডেপুটেশন দেয়। হিন্দমোটরের তরুণীর ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনিক বিলম্ব এবং ধর্ষণের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের ব্যাপারে পুলিশের অনীহার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তারা এস ডি পি ও-র কাছে দাবি জানান। উত্তরে এস ডি পি ও জানান যে, উত্তরপাড়া থানার আই সি এবং আই ও নাকি এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নন। তার এই অদ্ভুত জবাব চূড়ান্ত প্রশাসনিক অপদার্থতাকে আরও একবার বে-আব্রু করে দিল। এর পরের দিনই উত্তরপাড়া থানার আই সি-কে অবিলম্বে বরখাস্তের দাবিতে চলে এই দীর্ঘ প্রতিবাদী গণঅবস্থান। অপরাধীরা ইতিমধ্যে ধরা পড়লেও তাদের অপরাধকে লঘু করে দেখানোর ও ধর্ষণের সাক্ষ্য প্রমাণ অর্থাৎ ঘটনাস্থলে থাকা রক্তের নমুনা, তরুণীর ধর্ষিতা হওয়ার সময়ের পোষাক, মৃতদেহের ছবি ইত্যাদিকে সংরক্ষণের বিষয়ে পুলিশের যে ইচ্ছাকৃত টালবাহানা চলছে তার বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া থানা এলাকার অন্তর্গত সমস্ত মানুষের কাছে অবস্থান থেকে সরব হতে আহ্বান জানানো হয়। অবস্থানে পার্টি ও গণসংগঠনগুলোর স্থানীয় ও হুগলী জেলা কমিটির নেতা-কর্মীবৃন্দ সহ রাজ্য নেতৃত্ব এবং বহু সাধারণ মানুষ ধর্ষিতা ও মৃতা তরুণীর পরিবারের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, হুগলী জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, চৈতালী সেন, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়তু দেশমুখ, তপন বটব্যাল, লোকাল কমিটির সম্পাদক অপূর্ব ঘোষ, সদস্য প্রদীপ সরকার, রঞ্জিত রায়, বাবু দে, জেলা কমিটির ভিয়েত ব্যানার্জী, বটকৃষ্ণ দাস, মহিলা সমিতির মিঠু পাল ও ছাত্র নীলাশীষ, সৌরভ সহ আরও অনেকে। গণশিল্পীরা পরিবেশন করেন গণসঙ্গীত। প্রশাসন-লুম্পেন অশুভ আঁতাতের উপর গণখবরদারির ডাক দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের আগামী কর্মসূচী নির্ধারণ করতে এলাকার মানুষদের সাথে মত বিনিময় করতে আইপোয়া, আর ওয়াই এ, এ আই এস এ-র ডাকে আগামী ৩ আগস্ট হিন্দমোটর নন্দনকানন এলাকার 'জ্যোতি' সভাগৃহে এক নাগরিক কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে।

বলাগড়ে ধর্ষণের বিরুদ্ধে থানা ডেপুটেশন

হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের গুপ্তিপাড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাহাতো পাড়া গ্রামে গত ২০ জুলাই এক অসহায় আদিবাসী গৃহবধুকে দুশ্চরিত্র যুবক ভিক্টর বিশ্বাস ধর্ষণ করে যা গণ মাধ্যমে চর্চিত হয়। ২২ তারিখ সি পি আই (এম এল) ব্লক কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ব্লক থেকে পরিদর্শক টীম যাবে নির্যাতিতার বাড়িতে। ২৪ জুলাই ব্লকের পক্ষ থেকে দুজনের একটা অনুসন্ধান টীম যায়। অনুসন্ধান দলে ছিলেন ব্লক সম্পাদক অসীম ব্যানার্জী এবং সেখ আনারুল। অনুসন্ধানদল ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা রঞ্জিত মাহাতো (পরিচিত)-কে নিয়ে নির্যাতিতার বাড়িতে যায় এবং সমস্ত ঘটনা জানতে চায়। নির্যাতিতার বাড়িতে তিনি এবং তাঁর স্বামী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জা জ্যোৎস্না মাহাতো এবং উপস্থিত প্রতিবেশী মহিলা ও অন্যান্যরা জানান নির্যাতিতার স্বামী বোবা। কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হন নির্যাতিতার শ্বশুর এবং কাকা শ্বশুর কটা মাহাতো। তাঁরা জানালেন ঘটনার দিন বাড়ির পাশেই মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। ফলে বাড়িতে কেউ ছিল না, নির্যাতিতা বাড়ির কাছে মাঠে ছাগল বাঁধতে যান। মাঠে একটা কালভার্টে বসেছিল ভিক্টর বিশ্বাস। তিনি যখন ছাগল বাঁধছিলেন তখন পেছন থেকে মুখ টিপে ধরে জোরপূর্বক পাটের ক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরিবারের লোক বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে খোঁজাখুজি শুরু করে এবং পাট ক্ষেত থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় খুঁজে পায় এবং ঘটনার কারণ শুনে পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশিরা ভিক্টর বিশ্বাসের বাড়ি চড়াও হন। পঞ্চায়েত প্রধান পুলিশে খবর দিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দেন। এফ আই আর দায়ের হয় ও ভিক্টর বিশ্বাস এখনও জেলেই আছে। তাঁরা আরও জানান বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য যুবকটির মা ত্রিশ হাজার টাকার প্রস্তাব দেয়, পরিবারটি তা প্রত্যাখান করে। গ্রামবাসীরা আরও জানান ভিক্টর বিশ্বাস এর আগে আরও দুজন নারীর শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেছিল। এরকম ঘটনা এ এলাকায় প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তা পাড়ার মাতব্বর ও শাসকদলের লোকেরা বিভিন্ন সময়ে টাকা পয়সা লেনদেন করে চুপি চুপি মিটিয়ে দেয়। যা পরোক্ষে ধর্ষণকারী বা বদমাসদের মদত যোগায়। সবকিছু শুনে ব্লক থেকে থানা ডেপুটেশন স্থির করা হয় ২৭ জুলাই, নির্যাতিতা পরিবার সহ প্রতিবেশিদেরও আহ্বান জানানো হয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় পোস্টারিং করা হয়। কিন্তু ডেপুটেশনে নির্যাতিতার পরিবারের কেউ উপস্থিত হননি স্থানীয় তৃণমূল পার্টির চাপে। ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল বলাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন এবং স্মারকলিপি দেন। কিভাবে বিহিত করা যায় সেই কথাবার্তাও হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন স্বপন গুহ, সেখ আনরুল, শোভা ব্যানার্জী ইত্যাদি।

দাবি করা হয়—৬০ দিনের মধ্যে যথাযোগ্য চার্জশীট দিতে হবে; আসামীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; ঘটনাটির জামিন অযোগ্য ধারায় তদন্ত করতে হবে; সমস্ত নারীর সুরক্ষা প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সকল থানায় মহিলা পুলিশ সেল থাকতে হবে এবং মহিলা পুলিশ দ্বারাই তদন্ত করতে হবে।

ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল ব্লাড ব্যাগ ডিভিশনের ঠিকা শ্রমিকরা গণঅবস্থানে

কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল (ই মেইল) ব্লাড ব্যাগ ডিভিশনের ৪৪ জন ঠিকা শ্রমিক গত ২৩ জুলাই থেকে গণেশ এ্যাভিনিউ-র সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থায়ীপদে লোক নিয়োগ না করে সংস্থার পক্ষ থেকে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। গত ৩ মাস যাবত শ্রমিকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই কারখানাটির পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে। পরবর্তীতে পরিবর্তনের সরকারও একইভাবে উদাসীন থেকেছে। কারখানাটি পুনরুজ্জীবিত করা, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন এবং পুনরায় কারখানার উৎপাদন চালু করার দাবিতে অবস্থান চলছে। ২৮ জুলাই এ আই সি সি টি ইউ কলকাতা জেলা সভাপতি প্রবীর দাস এবং জেলা কমিটির নেতা স্বপন রায়চৌধুরী অবস্থান মঞ্চে শ্রমিকদের সাথে দেখা করেন। প্রবীর দাস বক্তব্য রাখেন। আগামীদিনে কারখানা পুনরায় চালু করা, সকল শ্রমিকদের কাজ দেওয়া এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে গৃহীত আন্দোলন কর্মসূচীতে এ আই সি সি টি ইউ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কোন্নগরে এ আই এস এ-র প্রতিবাদ সভা

এ আই এস এ-র কোন্নগড়-বালী আঞ্চলিক ইউনিটের পক্ষ থেকে কোন্নগড় স্টেশন সংলগ্ন চলচিত্রম মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা করা হয় ২৪ জুলাই। সাম্প্রতিক কিছু জ্বলন্ত স্থানীয় ও বৃহত্তর ইস্যুতে ছিল এই প্রচারসভা। যেমন, হিন্দমোটরে তরুণীর ধর্ষণকারি ও হত্যাকারি এবং তাদের মদতদাতাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে, রাজ্যের কলেজে কলেজে টি এম সি পি-র দাদাগিরি এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত বেআইনীভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তৃণমূল নেতাদের টাকা নেওয়া বন্ধ করা, ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, বামনগাছির প্রতিবাদী ছাত্র সৌরভ চৌধুরীর হত্যাকারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে, প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখন্ডে ইজরায়েলের হানাদারি ও নারকীয় গণহত্যা সংগঠিত করার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে মুখর হয় পথসভা। সভায় সামিল হয়েছিল স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, মহিলা, যুব ও নির্মাণ শ্রমিকরা। সভা পথচলতি মানুষের ও স্থানীয় দোকান ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের স্থানীয় ইউনিটের সম্পাদক নীলাশীষ, রাজ্য কমিটি সদস্য জয়মাল্য(আকাশ), নির্মাণ শ্রমিক সংগঠক প্রদীপ সরকার, সি পি আই (এম এল) কোন্নগড় আঞ্চলিক কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, কমিটির সম্পাদক অপূর্ব ঘোষ এবং এ আই এস এ-র রাজ্য সভাপতি মলয় তেওয়ারি, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক রণজয় এবং সভা সঞ্চালন করেন স্থানীয় ইউনিট সদস্য সৌরভ।

''অসতর্ক কোন ছত্রে
ধ্বনিবে না ক্রন্দন আমার''

কমরেড সরোজ দত্ত চারু মজুমদার সহ ৭০ দশকের গণহত্যার তদন্ত ও বিচার চাই

কমরেড সরোজ দত্ত-র ৪৩তম শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

৫ আগস্ট, কার্জন পার্ক, ধর্মতলা, বেলা ২টা

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ ও সরোজ দত্ত জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার

গণমঞ্চ

আয়োজিত

কনভেনশন

৭ আগস্ট, ২০১৪, বেলা ১টা

ফণিভূষণ মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি

বাগবাজার (গিরিশ মঞ্চের পাশে), কলকাতা

গণমঞ্চের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলো ঃ সামাজিক ন্যায় বিচার মঞ্চ, এম কে পি, লেফ্‌ট কালেকটিভ, র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিস্ট, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন,

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com